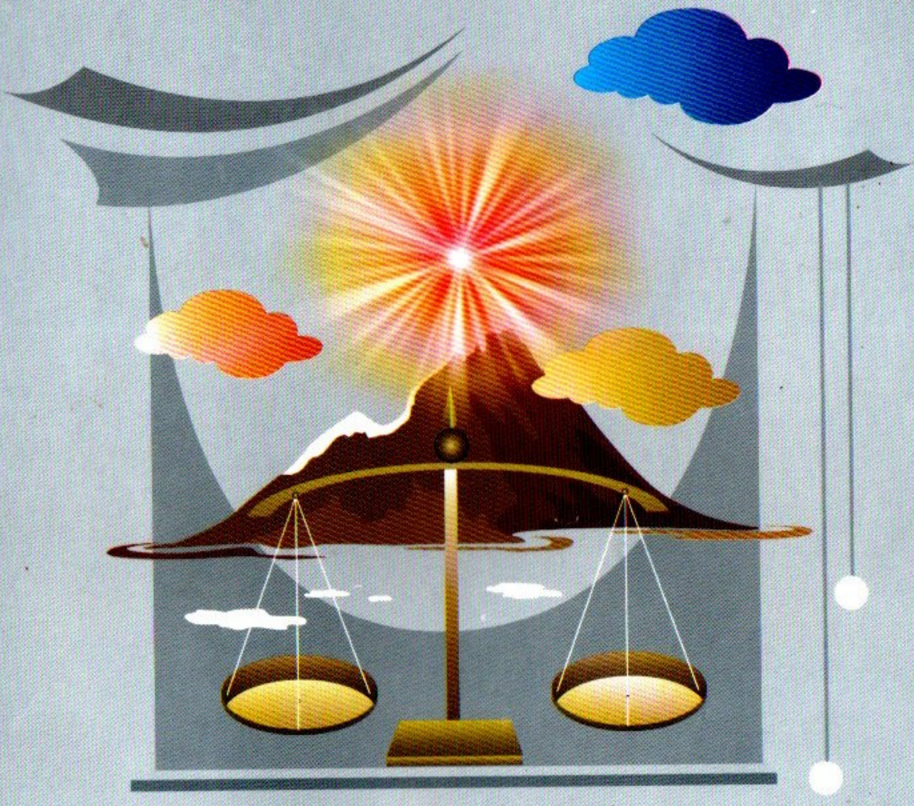
সত্যের মাপকাঠি

# সাহাবায়ে কেরাম (রা.)



মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ



ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০





য়া কুতুবখানা-ঢাকা

ইসলামিয়া কুতুবখানা-ঢাকা



সত্যের মাপকাঠি

# সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

রচনায়

মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

**সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)**

রচনায় ❖ মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
প্রকাশক ❖ আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম.এম
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
শব্দ বিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

**হাদিয়া ❖ ১৮০.০০ টাকা মাত্র**

# অর্পণ

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।।

–কাজী নজরুল ইসলাম

## নিবেদন

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পক্ষে যাদের অবস্থান। সাহাবাদের পদাঙ্কানুসারে নবী প্রেমে আসক্ত হয়ে যুগে যুগে যারা নিপীড়ন ও নির্যাতন সয়েছেন। নেফাকী মুখোশ উন্মোচন করেছেন। সর্বোপরি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইজ্জত রক্ষায় যারা শাহাদাত বরণ করেছেন। জান্নাতে তাদের উচ্চাসন কামনায়–

–লেখক

# প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দিগন্তহীন মরুপ্রান্তরে বা অকূল সাগর বক্ষে ভ্রমণ করতে গেলে গন্তব্য নির্ণয়ের একমাত্র মাধ্যম যেমন– আকাশের তারকা; তেমনি ফেতনামুখর পৃথিবীতে মুসলিম মিল্লাতকে স্ব-স্ব জীবন পথের সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করতে হলে ইসলাম গগনের নক্ষত্ররাজি রাসূলে আরাবী ﷺ -এর সাহাবীগণের উজ্জ্বল জীবনধারা অনুসরণ করতে হবে। একমাত্র তাদেরই মত, পথ ও আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ তাঁরা হলেন, এ উম্মতের জন্য সত্যের মাপকাঠিস্বরূপ। স্বর্ণ যেমন নিখাঁদ প্রমাণের জন্য কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ দিতে হয়, তেমনি আমাদের ঈমান, আকীদা ও আমলকে সঠিক ও নিখাঁদ করতে হলে তাঁদের জীবনধারার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। কেননা তারা এমন এক আদর্শ জীবনযাপন করে গেছেন, যার তুলনা দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। রাসূল ﷺ -এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ছিল কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল কুরআনের বাস্তব প্রতিবিম্ব। কুরআনপাককে কোনো ব্যক্তিগত জীবনে পরিপূর্ণরূপে দেখতে হলে একমাত্র আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায়। আর তাঁর বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের একেকটি প্রতিচ্ছবি হচ্ছেন রাসূল ﷺ -এর এক একজন সাহাবীর জীবনচরিত। তাঁর একান্ত সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধানেই ইসলাম গগনের নক্ষত্রমণ্ডলী সাহাবায়ে কেরাম কুরআন বুঝেছেন এবং ব্যাখ্যা শিখেছেন। মোটকথা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রাসূল ﷺ -এর বিভিন্নমুখী প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর দয়া-মায়া, নীতি-নিষ্ঠা এবং পরোপকারে অপরের মঙ্গলে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আদর্শ দেখতে হলে বিনা দ্বিধায় হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দিকে চোখ তুলে দেখা যায়। তেমনি নীতির প্রশ্নে কঠোরতা, দীন

প্রতিষ্ঠায় অসীম সাহসিকতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সীমাহীন প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। হযরত উসমানের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দানশীলতা, অন্তরের কোমলতা, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মত্যাগের অপূর্ব বিস্ফোরণ। তেমনি হযরত আলী (রা.)। এমনিভাবে সকল সাহাবায়ে কেরামই ঈমান, আকীদা, ইলম, আখলাক, মুজাহাদা, কুরবানি, ইখলাস ও ঐকান্তিকতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, নিরলস সাধনা তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছিলেন নবী জীবনের উত্তম নমুনা। তাঁরাই হলো আম্বিয়ায়ে কেরামের পর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মু'মিনদের মধ্যে সর্বোত্তম।

আদর্শ মানুষরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে চিনতে হবে রাসূল ﷺ -এর হাতে গড়া এই মুবারক জামাতের পরিচয়। জানতে হবে তাঁদের জীবনচরিত সম্পর্কে এবং নিতে হবে সে অনুপাতে নিজেকে গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। সেই পুণ্যবান সাহাবায়ে কেরামের সুমহান জামাতের সঠিক পরিচয় তাঁদের জীবন-কর্মকে মুসলিম মিল্লাতের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক ও গবেষক মাওলানা সাইফুল্লাহ সাহেব 'সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)' গ্রন্থে। বইটি আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এ তাকাযা অনুধাবন করেই আমরা তা প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-এর পক্ষ থেকে। প্রকাশ থাকে যে, এ সংস্করণটি দ্বিতীয়। আমরা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণটি পাঠকদের কাছে আরো বেশি সমাদৃত হবে। কারণ দ্বিতীয় সংস্করণে বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ উদ্যোগ কবুল করুন। আমীন!

**প্রকাশক—**

# সূচিপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|



# সূচনা

## সাহাবা অনুসৃত পথের বিকল্প নেই

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্ত। এক সন্ধানী পাঠকের ইচ্ছা হলো কিছু জানবে। জানবে পূর্বেকার অবস্থা। অবগতি লাভ করবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। কেমন ছিল তখনকার সমাজ ব্যবস্থা। কি রূপ ছিল ঐ সময়ের আবহাওয়া-পরিবেশ। এমনি কৌতূহল নিয়ে এক পাঠাগারে উপস্থিত হলো অনসুন্ধিৎসু ঐ পাঠক। পাঠাগারে সংরক্ষিত বিংশ শতাব্দীর জাতীয় দৈনিকগুলো উল্টাতে লাগল।

কি চোখে পড়বে পাঠকের? চোখে পড়বে পুত্রের হাতে পিতা নিহত। জোড়া খুন। রগ কেটে দেওয়া হয়েছে নাছীমের। নাহিদের দু'হাত কেড়ে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এসিডে ঝলসে গেছে মীনার গোটা শরীর। প্রেমপত্র গ্রহণ না করায় আক্রান্ত ঝানু। যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীর উপর নির্যাতন। পুলিশী নির্যাতনে রুবেল নিহত। ডাক্তার কর্তৃক রোগী নির্যাতিত। ঢাকা নগরীতে ব্যাঙের ছাতার মতো মসজিদ গজিয়ে উঠছে। আজানের আওয়াজ পতিতার চিৎকারের মতো লাগে। রবিন্দ্রসঙ্গীত চর্চা ইবাদতের শামিল। ৫ বছরের শিশু কন্যা পাশাবিকতার শিকার। ছাত্রের হাতে স্কুল শিক্ষক লাঞ্ছিত। এসব শিরোনাম দেখে ঐ সন্ধানী পাঠক কিভাববে? ঐ সময় কেমন ধারণা সৃষ্টি হবে আমাদের প্রতি। কি রূপ সভ্য সমাজ হিসেবে পরিগণিত হবো আমরা?

আমরা এ কোন পচা-গলা আবহাওয়ায় বিচরণ করছি। কেমন দূষিত পরিবেশে অবস্থান করছি। যার নীরব স্পর্শে সমাজ দেহ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। এ সর্বনাশ কারা ডেকে আনছে? কারা ইন্ধন যোগায় এর নেপথ্যে। আমরা তা তলিয়ে দেখছি না এবং সন্ধানও করছি না। এসব বন্ধ হওয়ার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থাও নিচ্ছি না। তাই তারা আসছে। আসছে অতি সন্তর্পণে। নিঃশব্দ পদচারণায়। নির্লিপ্ত নিঃশ্বাসের গতিধারায়। প্রবেশ করছে সূচাগ্রের তীক্ষ্ণতায় হৃদপিণ্ড গহবরে আর মস্তিষ্কের ভাঁজে ভাঁজে। ক্ষত-বিক্ষত করছে বিবেক-বিবেচনার কেশগুচ্ছ। লোহিত কনিকাকে করছে অপবিত্রতার ছোঁয়ায় নিকষ কালো কাক সদৃশ্য। ফলশ্রুতিতে আমরা কা-কা শব্দের কর্কশতায় কাকে মারবো, কাকে ধরবো, কাকে লাঞ্ছিত করবো– এর হোলি খেলায় দিশেহারা। এ বিভীষকা কতো দিন চলবে! এ কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ কি আদৌ সম্ভব নয়?

সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। তবে আমাদের নির্ণয় করতে হবে মুক্তির দিক চিহ্ন। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজে বের করতে হবে সফলতার রাজপথ। যেথায় বাস করে শান্তির পায়রারা। অবশ্য এজন্য আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। একটি সত্য পরীক্ষিত সত্যের প্রতি তাকালেই সামাধান বেড়িয়ে আসবে। চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইসলামপূর্ব সমাজ ব্যবস্থা ও আজকের সমাজের কোনো তফাৎ নেই। নেই হাল-চালের কোনো গড়মিল। তখনকার অরাজকতা ও আজকের অরাজকতা সমানে সমান। সুতরাং তৎকালে যে আদর্শ সামনে রেখে মানুষ মুক্তি পেয়েছিল, পেয়েছিল পরিত্রাণ। সে পথ ধরেই আমাদের চলতে হবে। ইসলামের সেই শাশ্বত আদর্শ সামনে রেখেই অগ্রসর হতে হবে।

তবে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে ইসলামি আদর্শের ফাউণ্ডেশন কিসের উপর। কিসের উপর ভিত্তি করে ইসলাম নামক বৃক্ষটি ডাল-পালা ছেড়েছে। মূলত কুরআনে কারীমই হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সরাসরি দেওয়া জীবন বিধান। কিন্তু এ কোরআন হলো সংক্ষিপ্ত। অতি সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে এর বিধি-বিধানগুলো। তাই এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে হাদীসে। হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার কোরাআনে কারীমই ব্যাখ্যা স্বরূপ।

সুতরাং নিছক কোরআন নয়, কোরআন হাদীস উভয়টিই আমাদের জীবন বিধান। দু'টির একটিকেও ছাড়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলার আহকাম হিসেবে দু'টিই আমাদের মেনে নিতে হবে। তবে কথা এখানেই শেষ নয়। কুরআন হাদীস হলো বিধান। আর বিধান বাস্তবতার রূপ লাভ করলে তা যথাযথ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ঐ বিধানে কোনো খুঁত বের করার অবকাশ থাকে না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার দেওয়া দ্বীনকে শুধু বিধানের উপর সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিধানের পাশাপাশি বাস্তব নমুনাও পেশ করেছেন। যেন সঠিক পথটি বের করা উম্মতের জন্য কঠিন না হয়ে যায়। কুরআনের বাস্তব নমুনা হিসেবে দিয়েছেন রাসূলে কারীম ﷺ -কে আর হাদীসের বাস্তব নমুনা হিসেবে মনোনীত করেছেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পবিত্র জামাতকে। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কুরআনের সংক্ষিপ্ত বাস্তব নমুনা হচ্ছে একক রাসূল ﷺ। আর বিস্তৃত হাদীসের বিস্তৃত নমুনা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। অতএব, ফল দাঁড়াল এই যে, কোরআন-হাদীস রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সমষ্টিতে ইসলাম নামের দেহটি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর মধ্য হতে কেউ একটিকে বাদ দিলে সে পূর্ণাঙ্গ দীন থেকে সড়ে পড়বে। একটি উদাহরণ পেশ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনে



সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, 'তোমরা নামাজ আদায় কর।' শুরু করলেন রাসূল ﷺ নিজে নামাজ আদায় করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ সাহাবীদের বলেন, 'তোমারা নামাজ আদায় কর আমাকে যেমন আদায় করতে দেখো।' সাহাবাগণ (রা.)-এ হাদীস শুনে রাসূল ﷺ -এর নামাজের প্রতি লক্ষ্য করলেন। কিভাবে নামাজ আদায় করতে হয়। কোন্ রুকনের পর কোন্ রুকন। কোন সময় বসতে হয়, কোন সময় দাঁড়াতে হয় ইত্যাদি দেখে নিজেরাও নামাজের জন্য তৈরি হয়ে যান। রাসূল ﷺ এখন আর একা নয়, বরং জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেন। রাসূল ﷺ ইমাম আর সাহাবাগণ (রা.) হলেন মুক্তাদি। সুতরাং পরবর্তী উম্মতের জন্য নমুনা হয়ে গেল, ইমাম কিভাবে নামাজ পড়াবে এবং মুক্তাদী কিভাবে নামাজ আদায় করবে। আর এই নমুনাটি সৃষ্টির পিছনে কুরআন, হাদীস, রাসূল ﷺ, সাহাবা (রা.) ৪টিরই অবদান আছে। এর মধ্যে থেকে ১টিকে বাদ দিলে আদর্শটির পূর্ণাঙ্গতা লাভ সম্ভব ছিল না। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ দীন পেতে হলে আমাদের এ চারটিকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ আমরা সাহাবীদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি। তন্দ্রমন্দ্র থেকে সমাধান প্রত্যাশা করছি। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। আমাদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা বেড়েই চলছে। অধিকন্তু কতিপয় বর্ণচোরা মহল এ জমানায়ও সাহাবীদের জীবনে কালিমা লেপনের অপচেষ্টায় লিপ্ত। ওদের রুখতে হবে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ওদের বিরুদ্ধে। মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে ওদের। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করুন। আমি তাদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ করব অন্তরটি পরিষ্কার করে বইটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। হয়তো আল্লাহ সঠিক বুঝ দান করবেন। বইটি প্রকাশে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, আমি তাদের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পুস্তকে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাকে জানালে আগামীতে শুধরিয়ে নেবো ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ তা'আলা পুস্তকটি কবুল করে নিন। আমীন!

**লেখক—**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## কেমন ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

রাতের আঁধার কেটে দিনের প্রখরতা নিয়ে যাঁদের আগমন, আকাশের উদারতা আর পর্বতসম সাহসিকতা নিয়ে যাঁদের আবির্ভাব, ফুলের মতো সুন্দর আর ফলের অন্তহীন সম্ভাবনা নিয়ে বাহ্যত যাঁরা ছিলেন উচ্ছল লীলাচঞ্চল অভ্যন্তরে সংযমী সাধক, যারা প্রকৃতির রুদ্র গম্ভীর রুক্ষ মূর্তিকে করেছিলেন স্নিগ্ধ শ্যামল কান্তি মায়া ঢাকা পাখি ডাকা ছায়ানীড়। ফলে বনানীর পত্রমর্মর, গিরি নির্জরের কুলুকুলু ধ্বনি, কুসুমের স্নিগ্ধ হাসি, বিহঙ্গের কলগীত– সব কিছুই ঠিক মতো চলতে থাকে ফের। দীনের জন্য যারা দুর্গম গিরি কান্তার মরু আর বন্ধুর পারাবার পাড়ি দিয়েছেন– তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।

স্বর্গের অফুরন্ত শান্তি, মৃতপ্রায় মানবতার জন্য সঞ্জীবনী সূরা ও পথহারা মানব কাফেলার জন্য হেরার অনির্বাণ জ্যোতি নিয়ে যে সকল মহান পুরুষ মাটির এ পৃথিবীতে স্বর্ণোজ্জল চিহ্ন এঁকে দিয়ে জগতের যথার্থ কল্যাণসাধনে নিবেদিত হয়ে মানুষের স্মৃতিপটে রচনা করে যান অমরত্বের আসন, তারাই হলেন নবীজির সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

হ্যাঁ, তাঁরাই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যারা গড়ে উঠেছেন নবী উদ্যানের মুবারক পরিবেশে, যাঁরা লালিত হয়েছেন আসমানি ওহীর পূর্ণ তত্ত্বাবধানে। নবীজির পূর্ণ সান্নিধ্যের বরকতময় পরশে যাঁদের জীবন হয়েছে ধন্য, যাঁরা গোলাপ পাপড়ির সৌরভ নিয়ে সভ্যতার মরাকুঞ্জে এনেছিল ফলে ফুলে সুশোভিত এক চির বসন্ত এবং মানবসভ্যতার সর্বকালীন আদর্শ। সেই মানব কাফেলাটির নাম– 'সাহাবা' রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম।

পাপ পঙ্কিলতার রাহুগ্রাসে আচ্ছাদিত, শোষণ-ত্রাসের বিষাক্ত ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত, লু হাওয়া আর সাইমুমের বুকে চাপ চাপ তাজা রক্তে রঞ্জিত করে যাঁরা ইসলাম নামক বৃক্ষটির শিকড় প্রোথিত করেছিলেন, পর্যায়ক্রমে পত্রে পুষ্পে পল্লবিত হয়েছে যাঁদের অবদানে ইসলাম, একদিন সে চারা মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে যাদের ত্যাগ ও কুরবানির বদৌলতে, তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম।

সর্বোপরি একটি সত্য-সুন্দর সোনালী আদর্শ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে রাসূলে আরাবী ﷺ -এর ডাকে তার জীবদ্দশায় যে সকল মহামনীষী সাড়া দিয়েছেন, ঈমান এনেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে ঈমানের উপর অটল অবিচল ও সুদৃঢ় ছিলেন, তারাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম।



তাঁরা ছিলেন নবী জীবনের সার্বক্ষণিক সহচর। নবীর সাথী। তার সুখ দুঃখের সাথী। আনন্দ-বেদনার সাথী। রাসূল-আগমন পূর্বে যাঁরা ছিলেন সত্য ত্যাগী, রাসূল ﷺ -এর ছোঁয়ায় হলেন সত্যানুরাগী। স্বয়ং রাসূল ﷺ ছিলেন শিক্ষা গুরু মুর্শিদ, সাহাবীগণ (রা.) হলেন তাঁর আদর্শ ছাত্র, ভক্ত মুরিদ। রাসূল ﷺ হলেন জ্ঞান সাগর আর সাহাবাগণ (রা.) হলেন সেই সাগরের ডুবুরী। রাসূল ﷺ ছিলেন, সাম্য ন্যায়ের পরশমনি যার কোমল পরশে শুভ্র সুন্দর হলো সাহাবাদের চরিত্র মাধুরী। রাসূল ﷺ ছিলেন মানবতার স্বর্গকানন আর সাহাবাগণ (রা.) হলেন সে কাননের কুসুম কলি। রাসূল ﷺ ছিলেন মানবীয় সকল গুণের আধার। আর সে আধারে লালিত সাহাবীগণ ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। রাসূল ﷺ ছিলেন উত্তম গুণাবলি সমন্বিত মালার মধ্যমণি, সাহাবাগণ (রা.) সে মালার মুক্তাধারা। রাসূল ﷺ ভাগ্যাকাশের মানবতার রবি, সাহাবাগণ (রা.) সে আকাশের তারকারাজি। রাসূল ﷺ একটি আলোক বর্তিকা, সাহাবাগণ (রা.) সে বর্তিকা বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল রৌশনী। রাসূল ﷺ রহমতের ফোয়ারা, সাহাবাগণ (রা.) সে ফোয়ারার ঝর্ণামালা। রাসূল ﷺ মৃগনাভীসম সুরভিত গন্ধ মধির, সাহাবাগণ (রা.) সে সুরভির অমীয় সুবাস। রাসূল ﷺ হলেন পূর্ণিমার চাঁদ, সাহাবীগণ (রা.) সে চাঁদের স্নিগ্ধরশ্মি। রাসূল ﷺ কাণ্ডারী, সাহাবাগণ সে পথের আদর্শ যাত্রী। রাসূল ﷺ প্রেমময়, সাহাবীগণ (রা.) সে প্রেমের স্বার্থক ভিখারী। রাসূল ﷺ জমাট বাধা মেঘমালা, সাহাবীগণ (রা.) সে মেঘের বারিধারা। রাসূল ﷺ রহমতের বারিধারা, সাহাবীগণ (রা.) সে ধারায় সিক্ত মরু বাসিন্দা। রাসূল ﷺ যে তরীর হা'ল ধরেন, সাহাবীগণ সে তরীর দাঁড় টানেন। রাসূল ﷺ যে যুদ্ধে সিপাহসালার সাহাবীগণ (রা.) সে যুদ্ধের রণবীর। রাসূল ﷺ যে মিছিলের পুরোভাগে, সাহাবাগণ (রা.) সে মিছিলে শ্লোগান তুলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন, হকের কেতনধারী, মানবতার পতাকাবাহী, দীনের মশালধারী, ঈমানী দীপ্তিতে দেদীপ্যমান, নির্মল আদর্শের ফল্গুধারা, সত্য ন্যায়ের নির্ঝরণী, উত্তম প্রতিশ্রুতি। প্রদীপ্ত চেতনার বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। সর্বোপরি তাঁরা হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীনের রেসালাতের প্রথম প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কোরআনে কারীমের মুখাতাব, নবী চরিত্রের প্রতিবিম্ব। প্রতিচ্ছবি। রাসূল ﷺ -এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। উম্মত ও রাসূলের মাঝে সেতু বন্ধন।

সাহাবীদের আগমনেও বিচরণে প্রকৃতি নব স্বাধে সজীব হয়ে উঠছিল সে সময়। প্রভাতের অরুন রাঙ্গা আকাশ। মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা লু ভরা বাতাস, নিস্তব্ধ নির্জনতা, রাতের ধ্যান গম্ভীর মৌনতা, দূরে দূরে গিরি উপত্যকার ধূসর শ্রী, মরু দিগন্তের

মায়া মরীচিকা সব কিছুতেই যেন সতেজতা সজীবতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল দারুণভাবে। মোটকথা তারা ইসলামের ইতিহাসে বিশাল আঙ্গিনা জুড়ে রাসূলের বিপ্লবী চেতনার সৌকর্য ভাস্বর হয়ে আছেন।

রাসূল ﷺ -এর সাক্ষাতে ঈমান এনেছেন, আল্লাহকে মেনে নিয়েছেন মনে প্রাণে। বিশ্বাস করেছেন প্রাণ পণে। যে বিশ্বাস ছিল শাণিতে অকৃতিম। ছিল না কপটতা অসারতা। যারা লাভ করেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সাক্ষাৎ। পেয়েছেন বরকতপূর্ণ সোহবত সান্নিধ্য। যাদের হৃদয়পটে ছিল খোদাপ্রেম ও রাসূল ﷺ -এর অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি। সম্মান ও মর্যাদার অকপট স্বীকৃতি চোখে মুখে ছিল না কালিমা কলুষতা। চেহারায় ইমানী দীপ্তি। অবয়বে প্রস্ফুটিত রাসূল ﷺ প্রীতি। যাদের রসনা উচ্চারণ করেনি কভু পাপাচার। পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় থেকে বের হয়নি মিথ্যাচার। নেত্রদ্বয়ের শ্যান দৃষ্টি ছিল দীনের প্রতি। কভু ফিরে তাকাননি অসার অশ্লীলতার প্রতি। কান শুনেছে আজান ধ্বনি, মুআজ্জিনের সুরেলা কণ্ঠের অমীয় বাণী। দু'হাত কভু করেননি সম্প্রসারিত অন্যায়ের প্রতি। ছিল সদা সিদ্ধহস্ত দীনের প্রতি। অন্যায় অত্যাচারে করেননি মাথা নত, জুলুম শোষণ হয়েছে যত। যাদের হুঙ্কারে শত্রু ছিল ভীতসন্ত্রস্ত, তাদের ডাকে মজলুম হতো আশ্বস্ত। নিপীড়ন নির্যাতন সয়েছে অম্লান বদনে। জবাব দিয়েছে উপযুক্ত প্রয়োজনে। তারাই হলেন সাহাবা (রা.)।

সাহাবা শব্দটি আরবি صَاحِبٌ -এর বহুবচন صُحْبَةٌ মূলধাতু থেকে নির্গত। صُحْبَةٌ অর্থ– সংশ্রব, সান্নিধ্য। যেহেতু সাহাবীদের এ দুর্জয় কাফেলা রাসূল ﷺ -এর সাথে সংশ্রবে থাকতেন। তাই তাদেরকে সাহাবী (রা.) বলা হয়। তাদের তত্ত্বাবধান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। পরিচালনায় রাসূল ﷺ। বিপদে ভয় নেই। নির্যাতনে কষ্ট নেই। এমনি ইস্পাতকঠিন প্রাচীর শত্রুর মোকাবিলায়। নিঃসীম আকাশের উদারতা। স্বর্গের অফুরন্ত শান্তি ছিল কামনা। প্রত্যাশা ছিল মৃতপ্রায় ইসলামে সতেজ সজীবতা আনা। লক্ষ্য ছিল হেরার অনির্বাণ জ্যোতির রেখা টেনে দেওয়া মাটির এ পৃথিবীতে। এক কথায় নববী উদ্যানের মুবারক পরিবেশে আসমানি ওয়াহীর পূর্ণ তত্ত্বাবধানে নবীজির পূর্ণ সান্নিধ্যের বরকতময় পরশে মানবসভ্যতার সর্বকালীন আদর্শ যে মানব কাফেলাটি গোলাপ পাপড়ির সৌরভ নিয়ে সভ্যতার মরাকুঞ্জে এনেছিল ফলে ফুলে সুশোভিত এক চির বসন্ত তারাই সাহাবী হিসেবে পরিচিত। যারা হেরার জ্যোতি আহরণ করে জগতের কল্যাণসাধনে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে মানুষের স্মৃতিপটে রচনা করে যান অমরত্বের আসন। তারাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম।



## সাহাবা পরিচিতি

اَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَالِكَ اَنَّ الصَّحَابِىَّ مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ وَمَنْ رَوٰى عَنْهُ اَوْلَمْ يَرْوِ وَمَنْ غَزَا مَعَهٗ اَوْلَمْ يَغْزُ وَمَنْ رَاٰهُ رِوَايَةً وَلَوْ يُجَامِلْهُ وَمَنْ لَمْ يَرَهٗ لِعَارِضٍ -

অর্থাৎ আমার জানা মতে সাহাবী এর উত্তম ও বিশুদ্ধ সংজ্ঞায় বলা হবে যারা রাসূল ﷺ -এর সাক্ষাতে ঈমান এনেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল অবিচল ছিলেন। সুতরাং যারা নবী করীম ﷺ -এর খুব বেশি সংশ্রব লাভ করতে পারেননি তারাও সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, যারা রাসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যারা করেননি উভয়ই এবং যারা রাসূল ﷺ -এর সাথে যুদ্ধ করছেন কিন্তু কোনো কারণবশত দেখা সম্ভব হয়নি সকলে সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। (اَلْكِنَايَةُ فِى عِلْمِ الرِّوَايَةِ ৫১নং পৃষ্ঠা)

হাফেজে হাদীস আল্লামা খতীব বাগদাদী (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর উক্তি নকল করেন قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِىُّ مَنْ صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ رَاٰهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ صَحَابِىٌّ। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেন, যে মুসলমান রাসূল ﷺ সংশ্রব-লাভে ধন্য হয়েছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন তিনিই সাহাবী।

এমনিভাবে হাফেজে হাদীস আল্লামা বাগদাদী (র.) ইমাম আহমদ (র.) -এর উক্তি নকল করেন– مَنْ صَحِبَهٗ سَنَةً اَوْ شَهْرًا اَوْ يَوْمًا اَوْ سَاعَةً اَوْ رَاٰهُ فَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ। যে নবী করীম ﷺ -এর সংশ্রব লাভ করেছে এক বছর, এক মাস, এক দিন অথবা সামান্য সময় অথবা সংশ্রব আসতে পারেনি তবে তাঁকে দেখেছে– তাহলে তিনিও সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত।

## আল কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ - (سُوْرَةُ الْحَجِّ)

অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন, তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত।

তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য।

উক্ত আয়াতে কারীমা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে রাসূল ﷺ -এর সাথি হিসেবে সাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নির্বাচন ও পছন্দের মধ্যে যারা শামিল তারা কত উঁচু মর্যাদার অধিকারী এর পরীক্ষা করা দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের প্রসঙ্গে বলেন–

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (سُوْرَةُ تَوْبَةُ)

অর্থাৎ, তবে রাসূল ﷺ এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছেন এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান মাল ব্যয় করে জিহাদ করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে প্রভূত কল্যাণ এবং তারা সফলকাম।

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে দীনের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, দীন ইসলামের উন্নতির জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। ফলে সাহাবীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সফলকাম।

একথা কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, কুরআনে কারীম নাজিল কালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈমান এনেছিলেন। ঐ সময় যারা ঈমান এনেছেন তারাই সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। সুতরাং তৎকালীন মুমিনদের জন্য দেওয়া সকল সুসংবাদ পুরস্কার সনদ যাবতীয় কিছুই সাহাবীদের প্রাপ্য এবং সাহাবীদের জন্যই ঐ সকল ঘোষণা। আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের ঈমানের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই মুমিনের সিফত দিয়ে কথা শুরু করেছেন। কুরআনে কারীমের অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۔

অর্থাৎ, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে তারা উঁচু মর্যদার অধিকারী তাদের তুলনায় যারা মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকের জন্যই



আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

## ত্যাগের মহিমায় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

রৌদ্রময় ভূখণ্ড আরব। রাসূলে আরাবী ﷺ -এর আগমন ঘটেছে এখানে। ৪০ বছর পার হয়ে গেছে। তাওহীদের বাণী প্রচার করছেন তিনি এখন। দাওয়াত দিচ্ছেন, আহ্বান করছেন লোকজনকে ইসলামের দিকে। রাসূল ﷺ -এর এ নিঃস্বার্থ ডাক রেখাপাত করল অনেকের হৃদয়ে। অনেকের সাথে বেলালের হৃদয়েও সাড়া জাগাল সে ডাক। দেখতে কালো দেখালেও তার অন্তরটি ছিল সুনির্মল। দুধের মতো পরিষ্কার, কাচের মতো স্বচ্ছ। তাইতো দীনের আলোয়, ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল তনুমন। সত্য আশ্রয় নিল হৃদয়ের মণিকোঠায়। গ্রহণ করে নিলেন ইসলামের অমিয় বাণী। কুফরির আঁধার কেটে তিনিও বের হয়ে এলেন আলোর পথে। রাসূল ﷺ -এর হাত ধরে পাঠ করলেন 'কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। স্বীকার করে নিলেন আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। তিনিই একমাত্র প্রভু। হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

তবে এসব কিছুই হলো গোপনে। চুপি চুপি সারা হলো সব কাজ। খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা হলো। যেন জানাজানি না হয়ে যায়। কারণ বেলাল ছিলেন একজন গোলাম। তার মনিব ছিল একজন কাফের। কট্টর কাফের। ছিল ইসলাম বিদ্বেষী। রাসূল ﷺ -এর চরম শত্রু। কুরআনের কথা শুনলে, রাসূল ﷺ -এর কথা শুনলে তার গাত্রদাহ শুরু হয়ে যেত। শুরু হয়ে যেত অন্তর্জ্বালা। ইসলামের নাম শ্রবণে সদা মর্মপীড়ায় ভোগতো সে। সুতরাং যদি কোনো রকম টের পায়, অনুভব করতে পারে তারই হাবশী গোলাম বেলাল ইসলাম গ্রহণ করেছে তাহলে তো কাম সারা। নির্যাতনের আর সীমা থাকবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়। বড়ই পরিতাপের কথা। একথা আর গোপন রইল না। জেনে ফেলল পাষণ্ড মনিব উমাইয়া। বেলালকে ডেকে পাঠাল সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। কিন্তু বেলাল তো মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি তো সত্য নবী থেকে সত্যের শিক্ষা লাভ করেছেন। তাই অকপটে স্বীকার করলেন। আমি ঈমান এনেছি একমাত্র প্রভু আল্লাহ তা'আলার প্রতি। তাঁর রেসালাতের প্রতি। নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি। উমাইয়া রাগে-ক্ষোভে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে। চোখ দু'টি থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে শাসায় বেলালকে। বেলাল! মারাত্মক অপরাধ করেছ। অমার্জনীয় অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এখনও সময় আছে

ফিরে এস। নতুবা জীবনের স্বাদ মিটিয়ে দিব। কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) তার একথায় মোটেই ভয় পেল না। ভ্রুক্ষেপ করলেন না এতটুকু। আপন মনে, আপন গতিতে কালিমা পাঠ করতে থাকেন তিনি।

'প্রভাবশালী কুফফার নেতা উমাইয়ার গোলাম ইসলাম গ্রহণ করেছে'– এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়। এতে উমাইয়ার প্রেস্টিজে আঘাত হানল ভীষণভাবে। শুরু হলো নিপীড়ন, নির্যাতন। উমাইয়ার নির্দেশে উত্তপ্ত মরুভূমিতে নেওয়া হলো হযরত বেলাল (রা.)-কে। অগ্নি-ঝরা লু-হাওয়া। হাওয়া নয়– এ যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। উপরে সূর্য উত্তপ্ত। খাঁ খাঁ করছে রোদ্ররা। খালি গায়ে দাঁড়ালে পিঠ পুড়ে যাওয়ার উপক্রম। মরুর তামাটে বালু লাল হতে চলছে। চিকচিক করছে উষ্ণ-শুষ্ক বালুকারাশি। তামার মতো গরম হয়ে আছে মরুভূমি। খালি পা দূরের কথা জুতা পা দিয়ে হাঁটাই মুশকিল। এমনি উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়ান হলো হযরত বেলাল (রা.)-কে। কোনো বিছানার উপর নয়, একেবারে সরাসরি বালির উপর। খালি গায়ে চিৎ করে শোয়ান হলো। বেলাল (রা.)-এর মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছে কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। উমাইয়ার নির্দেশে বেলাল (রা.)-কে এবার পাথর চাপা দেওয়া হলো। মস্ত বড় একটি পাথর তার বুকের উপর রেখে দেওয়া হলো। হায়! এখন কি উপায় হবে বেলালের? নিচে উত্তপ্ত বালু। পিঠ পুড়ে যাচ্ছে বালুর গরমে। উপরে সূর্যের তাপ। সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে গোটা শরীর। এর উপর আবার পাথর চাপা। কি করে সইবে বেলাল! আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-তরুলতা নির্বাক দাঁড়িয়ে প্রত্যাক্ষ করছে এ নির্মম পাশবিকতা। নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশ। কোথাও একটি পাতাও নড়ছে না ভয়ে আতঙ্কে। এই পিনপতন স্তব্ধ পরিবেশে বাতাসে একটি আওয়াজ ভাসছে– আহাদ আহাদ [আল্লাহ এক, আল্লাহ এক]। কিসের আওয়াজ। কোথা থেকে এ শব্দ আসছে। কার কণ্ঠে অনুরণিত হচ্ছে আরবি ভাষার ছোট্ট এ শব্দটি– আহাদ আহাদ [আল্লাহ এক, আল্লাহ এক]। না, অন্য কারো কণ্ঠে না, বেলালের কণ্ঠেই উচ্চারিত হচ্ছে তাওহীদের এ বাণী। বুকে পাথর চাপা থাকার কারণে শ্বাস-নিঃশ্বাস ঠিকমতো আদান-প্রদান হচ্ছে না। জিহ্বাটি স্বাভাবিক নড়াচড়া করতে পারছে না। ফলে সম্ভব হচ্ছে না পুরো কালিমা পাঠ করা তাই অতি কষ্ট করে কালিমার মর্মার্থ উচ্চারণ করছেন– আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।

কি অপরূপ এ দৃশ্য। ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। বেত্রাঘাতে দেহ জর্জরিত। শোণিত ধারায় সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত। অথচ তার মুখ থেকে বের হচ্ছে একই শব্দ আহাদ আহাদ। এভাবে সারাটা দিন কেটে গেল। ওদের লক্ষ্য ছিল বেলাল যেন



এসব কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ইসলাম থেকে ফিরে আসে। ইসলাম থেকে ফিরে না আসার কারণে হযরত বেলাল (রা.)-কে উঠিয়ে নিয়ে গেল মরুভূমি থেকে উমাইয়ার বাড়িতে। রাত হয়ে গেছে। নির্যাতনের ২য় পালা শুরু হলো। সারাটা দিন উত্তপ্ত মরুভূমিতে পাথর চাপা দিয়ে রাখা দেহটির উপর এবার শুরু হলো বেত্রাঘাত। অনবরত আঘাত শুরু হলো তার উপর। উমাইয়া নিজ হাতে আঘাত করতে লাগল। উমাইয়া ক্লান্ত হয়ে গেলে আবু জাহেল। এভাবে একের পর এক। এক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। কে কত মারতে পারে। আঘাত করতে পারে কে কত। আঘাতে আঘাতে জখম হয়ে গেল হযরত বেলাল (রা.) -এর শরীর। ঘা হয়ে যায় শরীরের জায়গায় জায়গায়। পাশবিকতার এখানেই শেষ নয়। ঘা শুকানোর জন্য ঔষধপত্র দূরের কথা স্বাভাবিকভাবে যেন না শুকিয়ে যায় সে ব্যবস্থাও নেওয়া হলো। ক্ষত-বিক্ষত দেহটিকে আবার মরুভূমিতে নেওয়া হয়। উপরের সূর্যতাপে ঘাগুলো যেন আরো ক্ষত হয়, ব্যথায় টন টন করে শরীর। সে লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা। হযরত বেলাল (রা.) -এর প্রাণ নিস্তেজপ্রায়। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। কি অপরাধ করেছে, কি অন্যায় করেছে বেলাল? অপরাধ একটা-ই! তিনি সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। আল্লাহকে সকল কিছুর মালিক বলে মেনে নিয়েছেন। এ অপরাধের কারণেই বেলাল (রা.)-এর আজ এই দুরবস্থা।

বেলাল (রা.) -এর উপর এ অমানুষিক নির্যাতনের খবর রাসূল ﷺ জানতে পারলেন। দয়াল নবী এ সংবাদ শুনে মর্মাহত হলেন ভীষণভাবে। হু হু করে কেঁদে উঠল প্রাণ। কিন্তু কি করবেন আল্লাহর নবী। কে বাধা দিবে! প্রতিবাদ করবে কে! কে গিয়ে বলবে ওদের সামনে সত্য কথাটি! গোলাম হয়েছে তো কি হয়েছে? তোমার কাজে তো কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি বেলালের ইসলাম। মনিব হিসেবে তুমি শারীরিক শ্রম নাও। কাজ করাও। যে কোনো কাজ। এতে তো বেলাল ত্রুটি করেনি। মনে মনে একটি মানসিকতা লালন করছেন বেলাল। একটি বাণী উচ্চারণ করছেন মাত্র। এতে তোমার আঁতে ঘা লাগল কেন?

মুসলমান জনবলে শক্তিবলে এখনো খুবই ক্ষীণ। চুপি চুপি চলে দাওয়াতের কাজ। তাই শক্তি দিয়ে ওদের বারণ করার কেউ নেই। এদিকে দরদী নবী ব্যাকুল হয়ে পড়লেন বেলালের জন্য। সইতে পারছেন না বেলালের এ কষ্ট। অস্থির হয়ে গেলেন কাণ্ডারী নবী করীম ﷺ। কাতর হয়ে পড়লেন দরদী রাসূল ﷺ।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ -এর সাথি। সুখ-দুঃখের সাথি। সব সময়ের সাথি। রাসূল ﷺ -এর অস্থিরতায়, বেলাল (রা.) -এর এ

কষ্টে তিনিও ভেঙ্গে পড়লেন। আহত হলেন দারুণভাবে। তিনি এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন অর্থ নিয়ে। পাষণ্ড উমাইয়া থেকে ক্রয় করে নিলেন বেলাল (রা.)-কে। ক্রয় করে আজাদ করে দিলেন।

হযরত বেলাল (রা.) এখন মুক্ত, স্বাধীন। রাসূল ﷺ -এর মুখে হাসি ফুটল, হাসি ফুটল অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মুখে। কৃতজ্ঞতা জানালেন সকলে হযরত আবূ বকর (রা.) -এর প্রতি।

এত কষ্ট, নির্যাতন সহ্য করে বেলাল (রা.) কি পেয়েছেন! কি অর্জিত হয়েছে তাঁর। হ্যা অর্জিত হয়েছে অনেক কিছু অনেক কিছু পেয়েছেন তিনি। মদিনার মুয়াজ্জিন হয়েছিলেন তিনি। রাসূল ﷺ -এর মুয়াজ্জিন ছিলেন তিনি। তাঁর আজানের আওয়াজ আল্লাহর আরশে পৌঁছে যেত। মসজিদে নববীতে একদিন বেলাল (রা.) -এর পরিবর্তে অন্য একজন আজান দেন। এতে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে পাঠান। যেন পুনরায় হযরত বেলাল (রা.) -এর মাধ্যমে আজানের ব্যবস্থা করানো হয়। আল্লাহর হাবীব পুনরায় বেলাল (রা.) -এর মাধ্যমে আজান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সর্বোপরি পেয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি। পরিণামে জান্নাত। জান্নাতে হযরত বেলাল (রা.) -এর মাথা উঁচু থাকবে। তাঁকে বিশেষভাবে দেখা যাবে। অল্পতেই সকলের চোখে পড়বেন তিনি।

## কে এই বেলাল?

মূল নাম আবূ আব্দুল্লাহ। তবে বেলাল নামেই তিনি পরিচিত। পিতার নাম রিবাহ আর মাতার নাম ছিল হামামাহ। তিনি ছিলেন হাবশী বংশের। পবিত্র মদিনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন একজন গোলাম। মনিবের নাম ছিল উমাইয়া বিন খালফ। হযরত বেলাল শারীরিক দিক থেকে ছিলেন হালকা গড়নের। গায়ের রং খুব কালো। চুল গুলো কালো কোকরানো। ইসলামে দীক্ষিত প্রথম সাতজনের মধ্যে হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন একজন।

তিনি ছিলেন মহানবী ﷺ -এর নিত্যসঙ্গী সার্বক্ষণিক সহচর। পথে ঘাটে বিভিন্ন স্থানে রাসূল ﷺ -এর পাশাপাশি থাকতেন। এমন কি রণাঙ্গনেও হযরত বেলাল (রা.) রাসূল ﷺ -এর পাশে থাকতেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালেও হযরত বেলাল (রা.) রাসূল ﷺ -এর পাশে ছিলেন। বিজয় যখন চূড়ান্ত, সকলের মনে যখন তৃপ্তির ঢেউ খেলছিল, সকলের দৃষ্টি তখন কাবার দিকে। পবিত্র কাবায় আজান হবে। ধ্বনিত হবে- আল্লাহু আকবার। কোন এমন ভাগ্যবানের সুরেলা কণ্ঠে



অনুরণিত হবে কল্যাণের বাণী। সালাতের বাণী। এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয় আজান। পবিত্র কা'বার আজান। এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ নির্দেশ দেন, বেলাল! যাও পবিত্র কা'বার ছাদের উপর উঠে আজান দাও। কথামতো বেলাল আজান দিলেন। বেলাল (রা.) -এর সুরেলা কণ্ঠের মধুর বাণী উচ্চারিত হলো মর্মে মর্মে। মাধুরী মাখা সে সুর বেজে উঠল সকলের হৃদয়ে। চারিদিকে পড়ে গেল রব রব সাড়া। যার কণ্ঠে একদিন আজান ধ্বনির সূচনা হয়েছিল, আজ পবিত্র কাবায় তারই কণ্ঠে অনুরণিত হলো আজান ধ্বনি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম ﷺ একদা ফজরের নামাজের পর হযরত বেলাল (রা.)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। বেলাল! বল তো তুমি এমন কি আমল কর। জান্নাতে আমি তোমার পদচারণার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, তেমন কিছু নয়। তবে আমি যখন ই অজু করি তখন দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করি।

প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে সকলেই তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতকালে একদা মক্কার কতিপয় লোক আমীরুল মুমিনের দরবারে উপস্থিত হলেন। প্রতিনিধি দলে হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দেন এবং তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে যান। হযরত ইকরিমা (রা.) -এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন আহবানকারী সকলকে একসাথেই ডেকে ছিলেন। কিন্তু আমরা সাড়া দিতে বিলম্ব করেছি। সুতরাং আজ সেই ব্যক্তি আগে সাক্ষ্য পাওয়ার উপযুক্ত যিনি আগে এসে সাড়া দিয়েছিলেন। সাড়া দিয়েছিলেন ইসলামের ডাকে সুশীতল ছায়াতলে।

## হযরত বেলাল (রা.)-এর বিবাহ

একদা ইবনে আবূ বকর (রা.) রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আমাদের বোনকে বিবাহ দিন। রাসূল ﷺ বললেন, বেলালকে পছন্দ হয়? ইবনে আবূ বকর কোনো কিছু না বলে চলে গেলেন। অন্য একদিন এসে ঐরকম নিবেদন পেশ করেন ইবনে আবূ বকর। রাসূল ﷺ একই উত্তর দেন। ইবনে আবূ বকর এবারও কিছু না বলে চলে যান। তৃতীয় বার যখন নবী করীম ﷺ একই প্রস্তাব দেন তখন ইবনে আবূ বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার মতেই আমাদের মত। অতঃপর বিবাহ হয়, সেমতে হযরত বেলাল (রা.) আবূ বকর (রা.) -এর জামাতা হলেন। রাসূল ﷺ ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল (রা.) সিরিয়া চলে যান। বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। বিশ হিজরিতে তিনি

ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ষাটের কাছাকাছি। সিরিয়ার দামেস্ক শহরের বাবুছ ছগীর নামক গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।

## ইতিহাসের নিষ্ঠুর বর্বরতা

প্রভাতের অরুণ রাঙ্গা আকাশ। মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা লু হাওয়া। নিস্তব্ধ-নির্জন রাতের ধ্যানগম্ভীর মৌনতা। দূরে দূরে গিরি উপত্যকার ধূসর শ্রী। মরুদিগন্তের মায়ামরিচিকা। সব কিছুই তাকে স্বাগত জানিয়ে ছিল।

তার সকল কাজে সকল কথায় কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠছিল। কখনো তিনি উষ্মা, কখনো বা তিনি উদাস। কখনো ভাবগম্ভীর। অন্তর সুদূর পিয়াসী। দৃষ্টি তার দিগন্ত প্রসারী। দূরের পানে আঁখি মেলে কি যেন ভাবেন তিনি। আকাশ যেন নীল নয়ন মেলে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। চাঁদ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তারারা যেন তাকে দেখে মিটমিট করে হাসে। বাতাস যেন তার কানে কানে গোপন কথা বলে যায়। এমনি এক সত্তার আবির্ভাব হলো পৃথিবীতে। আরবের মক্কা নগরীতে। নাম তাঁর মুহাম্মদ ﷺ। তাঁর উদয় হয়েছিল মানবতার রবি রূপে। উদয়লগ্ন থেকেই রবির আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। রবির এতটুকু আভা ছিটকে এসে পড়ল এক জীর্ণ কুটিরে। ছোট্ট এক পরিবারে। এক পুত্র নিয়ে গড়া স্বামী-স্ত্রীর এই ছোট্ট পরিবারে। স্বামী ইয়াসির আনাস গোত্রের লোক। হারানো ভাইকে খোজ করতে এসেছিলেন মক্কায়। কিন্তু মক্কা আর ছাড়া হলো না তার। এখানেই থেকে গেলেন। এখানেই বিবাহ হলো সুমাইয়ার সাথে। সুমাইয়া ছিল হাবশী দাসী। তার মানবিক কুরাইশ সর্দার আবূ হুজাইফা। মোটামুটি দিনাতিপাত করছিল তারা একমাত্র পুত্র আম্মারকে নিয়ে।

খেটে খাওয়া মানুষ ইয়াসির। সারাদিন কাজ করে যা পায় তা দিয়ে সংসার চলে। খুব একটা ভাবনা নেই। তেমন দুঃখও নেই। হঠাৎ ঘটে গেল এক ঘটনা। কাক ডাকা ভোর, থম ধরে বসে আছে ইয়াসির। কি যেন ভাবছে, কি যেন চিন্তা করছে। কারও সাথে কোনো কথা বলছে না। এভাবে বসে আছে। কেন? আবার কি হলো তোমার! জিজ্ঞেস করল সুমাইয়া। বিরক্ত করো না। আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও– উত্তর দিল ইয়াসির। কিন্তু সুমাইয়া নাছোড় বান্দা। তাই ইয়াসির এবার খুলে বলেন পুরো ঘটনা। একটি স্বপ্ন দেখেছি আজ। এক অস্বাভাবিক স্বপ্ন। কী সেই স্বপ্ন– কৌতূহলী মনে জিজ্ঞেস করল সুমাইয়া। ইয়াসির বলতে শুরু করল। একটি মালভূমি দেখলাম। মালভূমিটি মাঝারী ধরনের। চারদিকে পাহাড় ঘিরে আছে। অকস্মাৎ পাহাড়গুলো ফেটে গেল। ফেটে চৌচির। ফাটার ফাঁকা



ফাঁকা স্থান দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল। পাহাড়গুলোর বিপরীতে একটি বাগান। সবুজ ছায়া ঘেরা উদ্যানটি বেশ মনোরম। মুগ্ধকর পরিবেশ। নহর বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। সাদা পানি নয় মিষ্টি মধুর পানি। আনন্দে বিচরণ করছ তুমি সেই মোহিত পরিবেশে। বেশ সুন্দর লাগছিল তোমাকে। ইতোমধ্যে তুমি আমাকে দেখে ফেললে। দেখামাত্র আমাকে ডাকতে শুরু করলে। আমারও বেশ আগ্রহ তোমার কাছে যাওয়ার। কিন্তু ঐ আগুনের জন্য যেতে পারছি না। দোটানায় দুদল্য মনতায় দুলতে লাগালাম। আম্মার ছিল পিছনে।

পিছন থেকে আম্মার বলতে লাগল, আব্বা! সামনে যান। পিছনে ফিরবেন না। এই আগুন কিছু নয়। সাহস করে এগিয়ে যান। সামান্য কষ্ট না হয় হলো। এ কষ্টের বিনিময়ে মার মতো সুখী হবেন। ঐ দেখুন! মা কি সুন্দর পরিবেশে বিচরণ করছে। একদিকে তোমার হাতছানি। অপরদিকে আম্মারের উৎসাহ। পরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। জ্বলন্ত অগ্নি উপেক্ষা করে সামনে পা বাড়াতেই জাগ্রত হয়ে গেলাম। এখনও যেন গা জ্বলছে। ঐসব স্বপ্নের কথা রেখে এবার উঠ। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বস– এই বলে সুমাইয়া স্বপ্নপর্ব শেষ করে দিল।

ইয়াসির এখন বৃদ্ধ। কাজ-কাম খুব একটা করতে পারে না। তাই সংসারের ভার নিতে হলো আম্মারের। সারাদিন গতর খেটে যা রোজগার হয় তাই দিয়ে সংসার চলে। অবসরে সহযোগীদের সাথে মিলিত হয় আম্মার। আলাপ-আলোচনা করে। খোলামেলা আলোচনা, কোনো কৃত্রিমতা নেই তাদের মাঝে। যার যা মনে আসে অকপটে বলে ফেলে। কিন্তু ইদানীং আম্মারের সাথীরা তাকে এড়িয়ে চলা শুরু করল। কেমন যেন একটু দূর দূর ভাব। আগের মতো আন্তরিকতা নেই সাথীদের মাঝে। এ দূর দূরভাবে আম্মারের মনে দাগ কাটে।

একদিন হযরত আরকাম (রা.) -এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আম্মার (রা.)। ইতিমধ্যে তারই এক সাথী ঐ বাড়িতে প্রবেশ করছিল। আম্মারকে দেখে নিজেকে লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। আম্মার ছুটে গেল তার নিকট। কি ভাই কোথায় যাও। আমাকে পর ভাবছ কেন? আমি তো তোমাদেরই একজন। তোমাদের বিষয়টি আমায় একটু খুলে বল। লুকাও কেন। হযরত আম্মার (রা.) -এর মিনতি শুনে সাথি খুলে বলল। আল-আমীনের কথা শুনেছ নিশ্চয়। আল-আমীন একজন ভালো লোক। তিনি আমাদের মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছেন। মানুষ হিসেবে আমরা সকলে সমান। লাত উয্যা বলতে কিছু নেই। হযরত আম্মার (রা.) হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, সত্যি বলছ! হ্যাঁ সত্যি বলছি, চল আমার সাথে। এ বাড়িতেই

শান্তির দূত সেই আল-আমীন আছেন। তার কাছে জানতে পারবে বিস্তারিত। একথা বলে আম্মার (রা.)-কে ভিতরে নিয়ে গেল তার সাথী। রাসূল ﷺ -এর প্রথম সাক্ষাতেই আম্মার ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

আম্মার আজ আর অন্য দিনের মতো নয়। সতেজ ও সজীবতা নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে ফিরলেন বাড়িমুখে। বাড়ির আঙ্গিনায় পা রাখতেই জোড় গলায় হাঁক মারলেন মা বলে। ছুটে এলেন বৃদ্ধা মা সুমাইয়া। কিরে বাবা! আজ এত খুশি দেখা যায় কেন? মা! নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। আমরা কারো দাস নই মা। সকলেই আল্লাহর দাস এভাবে বলতে শুরু করলেন আম্মার (রা.)। এসব কি আবোল তাবোল বলছ বাবা। উযযা তোমার মঙ্গল করুন। সুমাইয়া আশীর্বাদ করলেন ছেলের জন্য। আম্মার (রা.) সাথে সাথে বলে উঠল উযযা বলতে কিছু নেই, মা। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আস্তে বল বাবা! এসব কে বলেছে তোমাকে। সুমাইয়া জানতে চাইল। উত্তরে আম্মার (রা.) বললেন, আল-আমীন। সুমাইয়া (রা.) আল আমীনের কথা শুনে বিশ্বাস করে নিলেন। কারণ তার জানা ছিল আল-আমীন কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আম্মার (রা.) -এর সাথে কালেমা পড়ে নিলেন সুমাইয়া (রা.)।

ইয়াসির (রা.) ঐ দিন বাড়ি ছিল না। অনেক দিন পর পাড়া-গাঁয়ে হাঁটতে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে কা'বার তওয়াফ করল। কা'বা চত্বরে কুরাইশদের দরবার বসেছিল। সেখানে গিয়ে একটু বসল। আলোচনা চলছিল আল আমীন মুহাম্মদ ﷺ -কে নিয়ে। আল-আমীন বেদীন হয়ে গেল! ছেড়ে দিল আমাদের ধর্ম! ইত্যাদি ছিল তাদের আলোচনার বিষয়। ইয়াছিরের সে আলোচনা ভালো লাগছিল না। তাই চলে আসল। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে দটলা। রাস্তার পার্শ্বে মরুভূমিতে এক লোককে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। অপরাধ হলো আল-আমীনের কথায় বেদীন হয়ে যাওয়া। এসব দেখে দুঃখ ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরল ইয়াসির (রা.)। সুমাইয়া (রা.)-কে বলল, মক্কার পরিবেশ কেমন যেন হয়ে গেছে। আল-আমীন নাকি বেদীন হয়ে গেছে। এই নিয়ে তুমুল হট্টগোল চলছে। সুমাইয়া (রা.) বললেন, আল-আমীন বেদীন নয়। ওরা বেদীন। ইয়াসিরও বললেন, হ্যাঁ আমার কাছেও আশ্চর্য লাগছে। আল-আমীনের মতো ব্যক্তি বেদীন হয় কি করে। আম্মার (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আব্বা আমি নিজে তার কথা শুনেছি। তার মতো লোক হয় না। চলুন আমরা তার ধর্ম গ্রহণ করি। ইয়াসির বললেন, এর পরিণাম ভেবেছ কি হবে? পরিণাম আর কি হবে? মরতে যখন হবে, তাহলে আর মানুষের দাস থেকে মরব কেন? আল্লাহর প্রকৃত দাস হয়েই মরি। দৃঢ়তার সাথে জওয়াব দিলেন পুত্র আম্মার (রা.)। সুমাইয়া

স্বপ্ন সত্য হলো এবং পুরো পরিবার ইসলাম কবুল করলো



(রা.) বললেন, আল-আমীনের ধর্ম গ্রহণ কর। আমিও আল-আমীনের ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমার বিশ্বাস আল-আমীন ও তার অনুসারীদের জন্যই হবে শুভ পরিণাম। ইয়াসির (রা.) বললেন, হ্যাঁ, বুঝেছি আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার কথা বলছ তোমরা আমাকে। স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে আমার। এভাবে ইয়াসির (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। আম্মার পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মিনতি সুরে, আগুন নয় আব্বা– শান্তি চির-শান্তি। ইয়াসির (রা.)-এর গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে।" একথা কানাকানি থেকে জানাজানি হয়ে গেল মক্কায়। কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ফুলে ফুঁসে উঠল আবূ জাহেল, আবূ লাহাব, উতবা, শায়বা, উমাইয়ারা। উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য পরামর্শে বসল। আবূ জাহেল বলতে লাগল, না। এ আর সহ্য করা যায় না। এভাবে আমাদের প্রতীমাদের নগ্নভাবে অপমান করা মেনে নেওয়া যায় না। আবূ তালেবের ভাতিজার এসব আবোল-তাবোল দমাতে হবে। উমাইয়া বলল, লক্ষ্য করেছ কিভাবে দাস-দাসীদের খেপিয়ে তুলছে। এখনই যদি একটা ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। তার সাথে সুর মিলিয়ে আবূ জাহেল বলল, অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিতে হবে ওদের। শায়বা আবূ জাহেলকে আরো খেপিয়ে তোলার লক্ষ্যে বলল, বেশি বেশি বড় কথা বল না। তোমার চাচার দাসী সুমাইয়া (রা.) ও তার ছেলে আম্মার মুহাম্মদের দলে ভিড়ে গেছে। অন্য একজন ইয়াসির (রা.) -এর কথাও স্মরণ করিয়ে দিল। আবূ জাহেল বলল, ঠিক আছে আজই ব্যবস্থা নিব। সকলেই বলে উঠল হ্যাঁ, অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। জয় উযযা জয় হুবল।

আবূ জাহেল অগ্নিশর্মা হয়ে বাড়ি ফিরল। সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত ইয়াসির (রা.) -এর দরজায়। কোনো কথা নেই। ইশারাই যথেষ্ট। বেঁধে ফেলল গোটা পরিবার। উত্তপ্ত গরম বালির উপর শুইয়ে দিল তাদের। উপরে আগুন চেপে ধরল একজন। আর থেমে থেমে ধারাল ছুরি দিয়ে আঘাত করছিল আরেক পাষণ্ড। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল তাদের গোটা দেহ। সকাল থেকেই নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিল। কোনোভাবে যদি লাত-উযযার কথা বের করা যায়। লাত-উযযার পক্ষে কোনো কথা। আবূ জাহেল ব্যর্থতার গ্লানিতে, আরও ক্ষুব্ধ হলো। ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। নির্যাতনের শেষ

এদিকে আল-আমীন যাচ্ছিলেন এই পথ ধরেই। সাথে ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। ছুটে গেলেন হযরত ইয়াসির (রা.)। বললেন, হে রাসূল! এভাবেই কাটবে আমাদের দিন! কি উত্তর দিবেন হুজুর ﷺ। দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়। চোখ টলটল করছে অশ্রুতে। কিন্তু বৈষয়িক কিছু করতে পারছেন না। সান্ত্বনা দিয়ে

বললেন, জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ইয়াসির (রা.)। সুমাইয়ার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ"। আল্লাহর ওয়াদা কভু মিথ্যা হয় না। এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি আমি। আম্মার (রা.)ও বসে নেই। তিনিও লাত উযযাকে– কটাক্ষ করতে কুণ্ঠিত হলেন না বিন্দুমাত্র। দূর থেকে কাফেররা এসব অবলোকন করছিল। কা'বার আঙ্গিনায় আবার বসল ওরা। আবূ জাহেল রাগে ছটফট করছিল। নিজে নিজেই বলছে– না, এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উতবা বলল, থামো! আস্ফালন করে লাভ নেই। দেখা গেছে তুমি কতটুকু পার! কই, দেব-দেবীদের পক্ষে একটি কথাও তো বের করতে পারলে না ওদের মুখ থেকে। আবূ জাহেল দৃঢ়তার সাথে বলল, এবার অবশ্যই বের করব। উতবা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। যদি পার তাহলে বিশটি উট দেওয়া হবে। পাশেই উপবিষ্ট শায়বা বলে উঠল আমিও বিশটি উট দিব। যদি একবার বের করতে পার দেব-দেবীর পক্ষে একটি কথা মাত্র। আর যদি না পার কিংবা তোমার আঘাতে আঘাতে যদি বুড়ো মারা যায় তাহলে? তাহলে তোমরা যাই বল তাই হবে। এ কথার স্বীকৃতি দিল আবূ জাহেল।

একটা দু'টা নয়। চল্লিশটি উট পাওয়া যাবে। আজ লক্ষ্যে পৌছতেই হবে। এ প্রত্যয় নিয়ে আবূ জাহেল অগ্রসর হচ্ছে। সাথে উতবা ও শায়বা। শুরু হলো আবার নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতন। সকল পাশবিকতাকে হার মানিয়ে আঘাত করছিল এই ছোট পরিবারটির উপর। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানকে এক সাথে এভাবে বেত্রাঘাত করছিল পাষণ্ড আবূ জাহেল। অপরাধ! অপরাধ একটাই। ওরা কেন আল্লাহ আল্লাহ বলে? কেন মুহাম্মদের কথা শুনে। এ জন্য এ বর্বরতা। কিন্তু শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে পর্বতসম সাহসী ছিল পরিবারটি। বিপদে ভয় নেই তাদের। উৎপীড়নে দুঃখ নেই। জীবন দানে কুণ্ঠা নেই। কি এক অক্ষয় কীর্তি। একটু পরে পরে অগ্নিমশাল চেপে ধরছিল গায়ে। কিন্তু এরপরও যখন কিছু হচ্ছে না তখন নির্যাতনের ধরন পরিবর্তন করা হলো। পানির ধারা ঢুকিয়ে দিল নাকের ভিতর। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। দেব-দেবীর পক্ষে টু-শব্দটিও বের হচ্ছে না তাদের মুখ থেকে। উপায় না দেখে সাঙ্গ-পাঙ্গদের হুকুম দিল। ওদের পানিতে নিয়ে যাও। চুবিয়ে রাখ ওদেরকে। আদেশ মাত্র হুড়মুড় করে চড়াও হলো আবূ জাহেলের সাঙ্গ-পাঙ্গরা এ জান্নাতী পরিবারটির উপর। টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেল পানিতে। পশুর মতো চুবিয়ে ধরল পানির ভিতর। শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে আবূ জাহেলের নির্দেশ হলো– উঠিয়ে নিয়ে আস। দেখি এবার শিক্ষা হয়েছে কিনা। তারা বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। হুঁশ আসা মাত্রই আল্লাহ আল্লাহ শব্দ বের হতে শুরু করল তাঁদের মুখ থেকে।



আবূ জাহেল দিশেহারা হয়ে পড়ল। আবূ জাহেলের মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষয়টি। আরও মারমুখী হলো সে। ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত কণ্ঠে সুমাইয়াকে লক্ষ্য করে বলল, যদি দেব-দেবীর পক্ষে কথা না বল, মুহাম্মদকে গালি না দাও, তাহলে এভাবেই মরতে হবে তোমাদের। আজকের রাত আর জুটবে না তোদের কপালে। আঘাতে আঘাতে পানির চুবানিতে ভেঙ্গে পড়ে ছিল বৃদ্ধা সুমাইয়া (রা.)। কিন্তু আবূ জাহেলের কথায় তার শরীরে প্রাণ সঞ্চার হলো। ঈমানী দীপ্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠল। জ্বলে উঠল সুমাইয়ার চোখ মুখ। প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে উঠল, ধ্বংস হোক তোর লাত– উযযা। নিপাত যাক তোদের কল্পিত তেত্রিশ কোটি দেবদেবী। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। মৃত্যু আমার কাছে খুব প্রিয় বস্তু। আমার মৃত্যু হলে ইন্তেকাল হলে, অন্তত তোর ঐ বিশ্রি চেহারা দেখা থেকে তো মুক্তি পাব।

আবূ জাহেলের আঁতে আঘাত লাগল। পাগলা কুকুরের মতো তেড়ে গেল সুমাইয়ার দিকে। এলোপাথাড়ি লাথি মারা শুরু করল বৃদ্ধা অসহায় দাসী সুমাইয়ার পেটে। পেটে খাচ্ছে লাথি। মুখে ফুটছে আল্লাহ আল্লাহ ধ্বনি। কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য! কিরূপ অম্লান স্মৃতি! আবূ জাহেল আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না নিজকে। বর্শা দিয়ে মারাত্মক আঘাত করল সুমাইয়ার লজ্জা স্থানে। ঢলে পড়লেন সুমাইয়া (রা.)। খসে পড়ল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এক হাবশী দাসী জান্নাতী রক্ত গোলাপ হয়ে ঝরে পড়লেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শহীদ হলেন এই ভাগ্যবতী মহিলা। স্বামী ইয়াসির (রা.) ও পুত্র আম্মারের (রা.) সামনেই ঘটল এ নিষ্ঠুরতা। ইয়াসির (রা)-এর বেদনা প্লাবিত হৃদয়ে করুণ আর্তি ভেসে আসল। অভিসম্পাত করলেন আবূ জাহেলকে। অভিশাপ দিলেন ওদের দেবদেবী সকলকে। চোখের সামনে মা জননীর এ নির্মম পরিহাস সহ্য হলো না আম্মারের। হৃদয়ের গহীন থেকে উচ্চকণ্ঠে ভেসে আসল কিছু কথা। উচ্চ কাতর কণ্ঠে অনুরণিত হলো শহীদ করে দিলি আমার মাকে। আল্লাহর দুশমন ধ্বংস অনিবার্য তোর। লানত তোর দেবদেবী সকলের উপর। রাসূলে করীম ﷺ আমার মাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ইয়াসির (রা.) সুর মিলিয়ে বললেন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, অবশ্যই সত্য।

বদমেজাজ আবূ জাহেল যেন পাগল হয়ে গেল এসব কথা শুনে। উম্মাদের মতো লাথি মারতে শুরু করল ইয়াসিরের তলপেটে। ইথারে একটি করুণ আর্তনাদ ভাসল। এরই সাথে মানবতার আকাশ থেকে আরেকটি নক্ষত্র খসে পড়ল। তিনিও পান করলেন শাহাদাতের অমীয় সুধা।

উতবা এগিয়ে আসল। আবূ জাহেলকে লক্ষ্য করে বলল, আগেই বলেছিলাম প্রাণ চলে গেলেও ওদের মুখ থেকে কিছুই বের করতে পারবে না। শায়বা বলল, তোমার বীরত্ব প্রদর্শনী যথেষ্ট হয়েছে। ছেলেটিকে এভাবে ছেড়ে দাও।

আম্মারের চোখের সামনে মা-বাবা শহীদ হলেন নির্মমভাবে। ছেলে হিসেবে কিছুই করতে পারলেন না তিনি কি অদ্ভুদ সমাজ ব্যবস্থা। এর কোনো প্রতিকার নেই, বিচার নেই এ সমাজে। নিথর নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল আহত আম্মার (রা.)। গুটি কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন মাত্র। ছুটে এলেন তারা কি বলে সান্ত্বনা দিবেন আম্মার (রা.)-কে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল তারা। এগিয়ে এলেন হযরত উসমান (রা.)। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করো না আম্মার (রা.)! তোমার পূর্বেই জান্নাতে চলে গেছেন তারা। রাসূল ﷺ তোমাদের তো জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কিসের। আম্মার বলল, আমার কোনো দুঃখ নেই, ব্যথা নেই। বাবা-মা আমার আগেই জান্নাতে চলে গেছেন। এতো খুশির কথা। তবে দুঃখ একটাই আমি কেন বেঁচে রাইলাম। আমাকে কেন মেরে ফেলল না ওরা।

জীবনকে ছোট মনে করো না আম্মার। তোমার বিস্তৃত জীবনে আরও অবদান রাখতে হবে। দুঃখ করো না। রাসূল ﷺ তো জীবিত আছেন আমাদের মাঝে। উসমান (রা.) এভাবে বুঝালেন আম্মার (রা.)-কে। উসমান (রা.)-এর কথায় আম্মার (রা.) সজীব হয়ে উঠলেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করে রাসূল ﷺ -এর দরবারে মাতা পিতা হারা আম্মার (রা.)।

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

'তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং লোক সকল থেকে আমি বেশি প্রিয় হব।'

রাসূল ﷺ -এর এ উক্তি নিজে বাস্তবায়ন করে পরবর্তী উম্মতের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গেলেন হযরত আম্মার (রা.)।

## মাতৃভূমি ত্যাগ

কুরাইশদের নির্যাতন যখন চরম আকার ধারণ করল। সাহাবীগণ (রা.) ও মহানবী ﷺ স্বয়ং যখন কুরাইশদের নিপীড়নে অতিষ্ট। এমন কি কুরাইশরা মহানবী ﷺ কে হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নিল। ঠিক এমন সময় মহানবী ﷺ সাহাবীগণ মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ পেলেন। তাই মহানবী ﷺ মদিনায় যাওয়ার জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নেন। মহানবী ﷺ -এর নিকট তারা সম্পদ টাকা পয়সা ইত্যাদি আমানত রাখত। মক্কাবাসীরা মহানবী ﷺ কে আল-আমীন বলে ডাকত। তাই তাঁর নিকট রক্ষিত আমানতগুলো যথাযথভাবে তাদের মালিকদের নিকট



পৌছে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা.) কে নির্দেশ দিলেন। অদ্য রাতে তুমি আমার শয্যার উপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুইয়ে থাকবে। ভোরে সকলের আমানত পৌছে দিয়ে তুমি মদিনায় চলে আসিও।

মহানবী ﷺ রাতের অন্ধকারে হযরত আবূ বকর (রা.) কে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে ইসলাম রক্ষার জন্য অতি দ্রুতগতিতে মক্কার অদূরে ছওর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। শহর হতে এ স্থানটির দূরত্ব মাত্র তিন মাইল। সেখানে পৌছতে মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। পরদিন যখন মক্কার লোকেরা জানতে পারল যে, হযরত গৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন এবং তার জায়গায় হযরত আলী (রা.) শুয়ে আছেন। রাতভর তাদের পাহাড়ার মাঝ দিয়ে মহানবী ﷺ -এর চলে যাওয়ায় তারা অত্যন্ত বিস্মিত হলো। তারা মহানবী ﷺ -এর সন্ধানে চতুর্দিকে বের হয়ে পড়ল। ঘটনা চক্রে তাদের কয়েকজন ছওর পাহাড়ের গুহার নিকট এসে উপস্থিত হলো। তাদের পদ ধ্বনি শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লেন। মহানবী ﷺ হযরত আবূ বকরের অবস্থা দেখে সান্ত্বনা দিলেন "চিন্তিত হইও না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"। এদিকে মহান আল্লাহর অপার মহিমায় মহানবীকে কাফেরদের হাত হতে রক্ষার জন্য পাহাড়ী গাছের শাখা প্রশাখাগুলো গুহার মুখে ঝুকে পড়ে। এবং একদল কবুতর গুহার সামনে বাসা তৈরি করে বাস করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে দেয়। কুরাইশরা যখন গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখতে পেল তখন তারা মনে করল সেখানে কোনো লোক নেই। তাই তারা তিন দিন অনুসন্ধান করার পর ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে যায়। মহানবী ﷺ গুহায় তিন দিন অবস্থান করেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাব বলেন, "রোজ সন্ধ্যায় হযরত আবূ বকর (রা.) -এর কন্যা আছমা (রা.) গুহায় খানা পৌছাতেন।

শত্রুদের সন্ধান কার্য ক্ষান্ত হলো। চতুর্থ দিন হযরত ﷺ ও আবূ বকর (রা.) গুহা হতে বের হয়ে মক্কা ও মদিনার সাধারণ পথ পরিত্যাগ করে লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে মদিনার পথে অগ্রসর হয়ে মদিনায় পৌছেন। যেহেতু মহানবী ﷺ মদিনায় হিজরতের পথে গারে ছওরে তিন দিন অবস্থান করেন। এ কারণেই এই স্থানের মর্যাদা ও গুরুত্ব ও ঐতিহাসিকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

## আবিসিনিয়ায় হিজরত

মহানবী ﷺ নিজে কুরাইশদের সক্রিয় শত্রুতা হতে নিরাপদ থাকলেও অন্যান্যদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। নিরীহ নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন

চলছে দেখে হযরতের কোমল প্রাণ কেঁদে উঠে। তৎকালে আরবের সাথে আবিসিনিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তখনকার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশীর হৃদ্যতার কথাও হযরতের জানা ছিল। তাই নবী কারীম ﷺ প্রতিবেশী রাষ্ট্র আবিসিনিয়ায় যাওয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন।

নবী করীম ﷺ -এর উপদেশ অনুপাতে নবুওয়তের ৫ম বৎসরের ৭ম মাসে ৬১৫ খৃঃ হযরত উসমান ও তার স্ত্রী রোকাইয়া (রা.) সহ ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আত্মীয়-স্বজন ধন সম্পত্তি ও জন্ম ভূমি মক্কার মায়া ত্যাগ করে আফ্রিকার আবিসিনিয়ার রাজ্যে যাত্রা করলেন। কুরাইশগণ এটা জানতে পেরে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু মুসলমানরা ইতোপূর্বেই তাদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ফলে পশ্চাদ্ধাবন কারীরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। মুসলমানগণ নিরাপদে আবিসিনিয়ার রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান এবং রাজ্যে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করলেন। এভাবে নব মুসলমানগণ কুরাইশদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কুরাইশ প্রধানরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা আশ্রিত মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়া হতে ফিরিয়ে আনার মনস্থ করে।

## বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

কুরাইশরা আশ্রিত মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়া হতে ফিরিয়ে আনার জন্য নাজ্জাশীর নিকট আব্দুল্লাহ বিন আবি রাবিয়াহ ও আমর বিন আশ নামক দু'জন প্রতিনিধিকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করল। বাদশাহ নাজ্জাশী কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে তাদের বক্তব্য পেশ করতে বলেন। বাদশাহ নাজ্জাশীও প্রতিনিধিদেরকেও মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের সর্ম্পকে কতিপয় প্রশ্ন করেন। অতঃপর বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদের কে ডেকে এনে তাদের বক্তব্যও শ্রবণ করেন। বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদের বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হলেন। ফলে কুরাইশদের অভিযোগ অগ্রাহ্য হলো এবং মুসলমানদের আর ফিরে যেতে হলো না। উপরন্তু তাদেরকে আবিসিনিয়ায় শান্তির্পূণভাবে বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কুরাইশ প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এভাবে মুসলমানগণ কিছুদিন আবিসিনিয়ায় অবস্থান করেন।

## হাবশায় পুনঃগমন

কিছুদিন অবস্থান করার পর মুসলমানগণ জানতে পারলেন যে, মক্কার অধিবাসীরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ সংবাদের সত্যতা যাচাই না করেই মুসলমানরা



মক্কায় ফিরে আসে। মক্কায় পৌছে সংবাদ মিথ্যা ও গুজব প্রমাণ পান। ওদিকে কুরাইশদের আক্রোশ ও অত্যাচার দ্বিগুণভাবে চলতে থাকে। তখন মহানবী ﷺ পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্য আদেশ দিলেন। এ সময় হিজরতকারীদের সংখ্যা ১৮ জন মহিলা সহ ১০০ জন ছিল। এ সকল মুহাজিরদের মধ্য হতে কতিপয় মুসলিম নর ও নারী পুনঃ মক্কায় ফিরে আসেন। আর বাকি সকলে কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর যখন মহানবী ﷺ মদিনায় হিজরত করেন তখন আশ্রিত মুসলমানগণও আবিসিনিয়া হতে মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন।

## অন্তরীণ অবস্থা

### শি'আবে আবী তালিব

এটা মক্কার একটি পাহাড়ি ঢালু দেশ। এখানে বনূ হাশেমের লোকজন বসবাস করতেন। এখানে দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত বনূ হাশেমের লোকজন অবরুদ্ধ জীবন যাপন করেন।

### শি'আবে আবী তালিবে অবস্থান :

কুরাইশরা দেখতে পেল যে, নির্যাতন ও নৃশংসতায় কিছুই হচ্ছে না। দিন দিন ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়ে চলছে। ইতোমধ্যে হযরত ওমর ও হযরত হামযাহ (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্ব ঈমান আনয়ন করেছেন। নাজ্জাশীও মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে চলছে। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। তাই তারা এ সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদের অবরুদ্ধ করে ধ্বংস করে দিতে হবে। এতদুপলক্ষ্যে মক্কার সকল গোত্র ৬১৬ খ্রি. এক জোট হয়ে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করল।

শর্ত ছিল কোনো ব্যক্তি হাশেমী গোত্রের সাথে কোনো প্রকার আত্মীয়তা স্থাপন করবে না। তথা প্রীতি সম্ভাষণ, বা কোনো কিছু আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় করবে না। তাদের সাথে সর্বাধিক সামাজিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন থাকবে যতক্ষণ না তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে হত্যা করার জন্য আমাদের নিকট সমর্পণ না করবে। এ চুক্তি পত্রটি মানসূর বিন আকরামা লিখে কা'বা শরীফের দেয়ালে লাগিয়ে দিল।

আবূ তালেব বাধ্য হয়ে খান্দানের সকল সদস্যসহ শি'আবে আবী তালেব-এ আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর বনূ হাশেম অবরুদ্ধ জীবন যাপন করেন। এ সংকটকালে তারা কখনো কখনো নিম গাছের পাতা ভক্ষণ করে জঠর জ্বালা নিবারণ করতেন।

এ সম্পর্কে হযরত সায়াদ বিন ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন একবার শুধু এক টুকরা শুকনো চামড়া পেলাম। আমি তা ধুয়ে আগুনে ভুনা করে পানি মিশিয়ে ভক্ষণ করলাম। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করত। দূর হতে কুরাইশগণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনে পরম পুলক অনুভব করত। একদা হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র স্বীয় গোলামের হাতে কিছু আটা হযরত খাদিজা (রা.) -এর নিকট প্রেরণ করল। পথে আবু জেহেলের সাথে দেখা হলে সে তা ছিনিয়ে নিতে চাইল। এমন সময় সেখানে আবুল বাখতারী হাজির হলো যদিও সে কাফের ছিল কিন্তু তার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়ায় সে বলল একজন লোক তার ফুফুর নিকট কিছু খাদ্য সামগ্রী পাঠাচ্ছে। এতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

একাধারে তিন বছর মহানবী ﷺ ও বনূ হাশেমের সকল সদস্য সঙ্কটময় অবরুদ্ধ জীবন যাপন করেন। পরিশেষে বিরুদ্ধ বাদীদের মাঝে পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে এ অশুভ চুক্তি ভঙ্গ করার আন্দোলন তাদের মাঝে গড়ে উঠল। বনূ হাশেমের নিকটতম প্রতিবেশী এবং সম্মানিত গোত্রপতি হিশাম আমেরী আব্দুল মুত্তালিবের দৌহিত্র যুবাইর-এর নিকট গমন করে বললেন তুমি এটা পছন্দ কর যে, তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার কর আর তোমার মামাগণ একবিন্দু দানা পানিও না পায়? একথা শুনে যুবাইর বললেন, আমি একা কি করব? আমার একজন সাথী পেলেও এ নির্যাতন মূলক অঙ্গীকার নামা ছিড়ে ফেলতাম। এরপর হিশাম, যুবাইর, আবুল বাখতারী ও যাময়া বিন আসওয়াদ সহ কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক হেরেম শরীফে গমন করেন। যুবাইর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করে বললেন এ অঙ্গীকার নামা ছুঁড়ে ফেলা না পর্যন্ত আমি শান্ত হব না। অবশেষে মুতরিম অঙ্গীকার নামাটি ছিঁড়ে ফেললেন। এরপর সকলেই বনূ হাশেমের নিকট গমন করে তাদের বন্দিদশা হতে উদ্ধার করলেন। এটা ছিল নবুয়তের দশম সালের ঘটনা। এ বছরই মে'রাজের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়েছিল।

## সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর আল্লাহভীতি

আল্লাহ আমাদের প্রভু। তিনি আমাদের পালনকর্তা, সৃষ্টি কর্তা। তাঁর নির্দেশেই আসমান-জমিন আপন অবস্থায় বিদ্যমান। তাঁরই ইশারায় চাঁদ, সূর্য, গ্রহ নিজ নিজ কক্ষ পথে নিয়োজিত। আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণ তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এ জন্য একজন বান্দার প্রয়োজন হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ রাজি খুশি হয়ে যায় এমন কাজ করা, আর আল্লাহ তা'আলা



রাজি খুশি হবেন তাঁর নির্দেশ মেনে চললে। তার হুকুম আহকাম মতো আপন জীবন কাটাতে পারলে। তার হুকুম আহকাম আমরা মেনে চলতে পারব তখন, যখন আমাদের অন্তরে তাঁর ভয় বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের যত ভয় থাকবে জীবন তত সুন্দর হবে। আল্লাহর আহকাম আমরা ততবেশি মেনে চলতে পারব। একথাটি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উপলব্ধি করেছিলেন যথাযথভাবে। অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপে। তাইতো তারা সদা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাড়িত থাকতেন। প্রতিটি মুহূর্তে হৃদয়ে আল্লাহভীতি জাগরুক থাকত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পেশ করা হলো।

## সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর রাসূল প্রীতি

হুদাবিয়ার সন্ধির সময় উরওয়া ছিল কুফফারে মক্কার দূত প্রতিনিধি। সন্ধি শেষে তিনি মক্কায় ফিরে যান। সেখানে গিয়ে আসহাবে রাসূলের বিবরণ দেন। বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি দূত হয়ে বিভিন্ন দেশে গেছি। বিভিন্ন বাদশাহর দরবারে গেছি। কিন্তু কোথাও এরূপ দেখিনি। মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথীরা তাঁর জন্য রীতিমতো পাগলপারা, নিবেদিত প্রাণ। কোনো বাদশাহর পরিষদমণ্ডলি এরূপ হওয়া তো দূরের কথা কাছাকছিও নেই।

কতিপয় সাহাবী (রা.) একদা হুজুর ﷺ -এর সাথে সফরে গেলেন। সাহাবাদের বাহন ছিল উট। উটগুলোর উপর ছিল লাল ডোরা চাদর বিছানো। পুরুষেরা লাল চাদর ব্যবহার করতে পারে না। উটের উপর বিছানো চাদর আস্তে আস্তে উট পরিচালকের উপর উঠে যায় কি-না এ চিন্তা বিরাজ করছিল হুজুর ﷺ-এর মাঝে। রীতিমতো শঙ্কাবোধ করছিলেন তিনি। একপর্যায়ে বলে ফেলেলেন, আমি লক্ষ্য করছি এই লাল রং ক্রমেই তোমাদের পেয়ে যাচ্ছে। রাসূল ﷺ -এর ক্ষোভ মিশ্রিত কথা শুনে সাহাবাগণ (রা.) ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যান। এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। তাদের এই বেহাল অবস্থা দেখে উটগুলোও ভড়কে যায়। সাহবাগণ (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে উট থেকে লাল চাদরগুলো খুলে ফেলেন।

## চাদর জ্বালিয়ে দেওয়া

রাসূল ﷺ বের হয়েছেন। সাথে অন্যান্য সাহাবীসহ আব্দুল্লাহ বিন আমরও ছিলেন। সাহাবীগণ (রা.) বাড়িতে থাকা অবস্থায় যেমন রাসূল ﷺ -এর দৃষ্টি পড়তেই চোখে-মুখে একটি বিষাদের ছাপ ফুটে উঠে। তেমনিভাবে বাহিরে গেলেও একই অবস্থা। হঠাৎ হুজুর ﷺ -এর অন্তরের ভিতর থেকে একটি প্রশ্ন

বেরিয়ে এল। গায়ে কি পড়েছ আব্দুল্লাহ? আব্দুল্লাহ (রা.) বুঝতে পারলেন, হুজুর ﷺ আমার লাল চাদর পরাটি পছন্দ করেননি। কুসুম রঙ হওয়াটাই এর মূল কারণ। লজ্জিত হলেন তিনি। খুবই লজ্জিত হলেন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.)। রাসূল ﷺ -এর অসন্তুষ্টি বিষিয়ে তুলল তাঁকে। মর্মপীড়ায় ভুগতে থাকেন তিনি। এমনি এক অসহনীয় জ্বালা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে রান্না ঘরে গেলেন। গিয়ে দেখেন রান্না ঘরের চুলায় আগুন জ্বলছে। সাথে সাথে চাদরটি খুলে উত্তপ্ত আগুনে ছেড়ে দেন। চাদরটি পুড়ে শেষ হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন। পরবর্তীতে আরেক দিন হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন। গায়ে চাদর ছিল না। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, চাদরটি কোথায়? উত্তরে বললেন, হে রাসূল ﷺ পুড়ে ফেলেছি। হুজুর ﷺ বললেন, পুড়বার প্রয়োজন ছিল না। একজন মেয়েলোককে দিলেই হতো।

## সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর আল্লাহভীতি

হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন, রাসূল ﷺ -এর সাথি। সব সময়ের সাথি। বিপদে-আপদে সব সময়ের সহচর। তাঁর জান্নাতি হওয়ার খোশখবরী বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা.) একদল জান্নাতির সর্দার হবেন। আটটি জান্নাতের প্রতিটি দ্বার হতে আহবান আসবে হে মহান পুণ্যবান নবীর সহচর! হে উম্মতে মুহাম্মদীর সর্দার! আসুন। আমার বক্ষে আসুন। আমার বুকে বিচরণ করুন। আপনার পদচারণায় ধন্য করুন আমাকে। আপনার পদভারে গর্বিত হতে চাই আমি। আপনার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে। কি চাই আপনার, ফলে ফলে ভরপুর আমার উদর। ফুলে ফুলে সুশোভিত গন্ধমধির আমার দেহ। রাসূল ﷺ একথাও বলেছেন- আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আবূ বকর (রা.) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জান্নাতের এ নিরঙ্কুশ ঘোষণা পাওয়ার পরও তিনি ছিলেন আল্লাহভীতির বে- মেছাল প্রতীক। সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে হৃদয় কাঁদত। পরিণামের কথা ভেবে, আল্লাহ তা'আলার বিচারের কথা ভেবে ভয়ে পরিতাপ করে বলতেন, হায়! আমি যদি বনের বৃক্ষ হতাম, আমি যদি বাগানের ঘাস হতাম কিংবা কোনো মু'মিনের পশম হতাম! তাহলে কোনো চিন্তা ছিল না। হিসাব-নিকাশ হতো না। আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যাপারে ছিল না। এসব বলতেন আর খওফে ইলাহীর তাড়নায় প্রকম্পিত থাকতেন।



একবারের ঘটনা হযরত রাবিয়া আসলামী (রা.)-এর সাথে সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। এতে দুজনের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলো। এ বচসায় হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একটি কথা রাবেয়া আসলামীর হৃদয়ে দাগ কাটে। রাবিয়া আসলামী কথাটিতে ব্যথা পেয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) তা অনুভব করলেন। এ কথা অনুভবের সাথে সাথে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। একজন মুমিনকে আমি কষ্ট দিলাম। আমার কথায় আল্লাহর এক বান্দার হৃদয় ব্যথিত হলো। আমার কি উপায় হবে, আমি কি জবাব দিব আল্লাহর কাছে। একথা চিন্তা করে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি রাবিয়া আসলামী (রা.) -এর নিকট গিয়ে বলতে থাকেন আমাকেও অনরূপ কথা বল, যা আমার হৃদয়ে আঘাত লাগে। তাহলে আমি এ অপরাধ থেকে মুক্তি পাব, পরিত্রাণ পাব। কিন্তু রাবিয়া আসলামী (রা.) রাজি হলেন না। হযরত আবু বকর (রা.) খুবই পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু রাবিয়া আসলামী (রা.) কিছুতেই রাজি না হওয়ায় হযরত আবু বকর (রা.) -এর ব্যস্ততা বেড়ে গেল। তিনি উপায় না দেখে ছুটে গেলেন রাসূল ﷺ -এর দরবারে। রাসূল ﷺ ঘটনার বিবরণ শুনে খুশি হলেন। উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। ডেকে পাঠালেন হযরত রাবিয়া আসলামী (রা.)-কে। তিনি উপস্থিত হলে রাবিয়া আসলামী (রা.)-কে রাসূল ﷺ বলেন- ঠিক আছে। তোমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে না এবং প্রত্যুত্তরে এরূপ কিছুই বলতে হবে না। কেবল 'হে আবূ বকর আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন' এতটুকু বললেই হবে।

একদা ঈদের নামাজ আদায় হলো। ঈদুল ফিতরের নামাজ। একমাস রোজা রাখার পর আজ ঈদের দিন। খুশির দিন। তাই সকলে হাঁসি মুখে ঈদগাহ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। সকলের চোখে-মুখে হাসি ফুটছিল। কিন্তু এক কোণে বসে হযরত আবূ বকর (রা.) কাঁদতে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আজ কি কাঁদার সময়। উত্তরে তিনি বললেন। হ্যাঁ, আজ ঈদের দিন। খুশির দিন। আনন্দ করা দরকার। কিন্তু আনন্দ কে করতে পারে। যার গুনাহ মাফ হয়েছে। আমার গুনাহ মাফ হলো কি-না, আমি তো জানি না। এ জন্য আমি কাঁদছি।

## হযরত ওমর (রা.) -এর আল্লাহভীতি

হযরত ওমর (রা.) -এর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। যার সম্বন্ধে স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন- আমার পর কেউ নবী হলে ওমর হতো। এমন ব্যক্তিত্বশীল ওমর (রা.)ও আল্লাহর ভয়ে কাতর থাকতেন। শুষ্ক তৃণলতা হাতে নিয়ে বলতেন, হায় আমি যদি এমন তৃণখণ্ড হতাম! তাহলে তো আমার ভয় ছিল না। শঙ্কা ছিল না। কখনো বলতেন, আমাকে যদি আমার মা গর্ভধারণ না করতেন!

হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতকালের একটি ঘটনা। হযরত ওমর (রা.) -এর রাষ্ট্র পরিচালনা ছিল সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক কাজের সময়সূচি ছিল সুনির্ধারিত। রুটিন অনুসারে যাবতীয় কাজ সমাধা করতেন। ব্যতিক্রম তিনি পছন্দ করতেন না। সহ্য করতেন না। একদা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। এমন সময় হঠাৎ এক অপরিচিত লোক এসে ঢুকে পড়েন। কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলতে শুরু করলেন, আমীরুল মুমেনীন! অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে। আমি এর প্রতিকার চাই। বিচার চাই। আপনি তার বিচারের ব্যবস্থা করুন। হযরত ওমর (রা.) ব্যক্তিটির অযাচিত আচরণে বিরক্ত হলেন এবং বেত্রাঘাত করে বললেন, বিচারের নির্ধারিত সময়ে কেন এলে না। এখন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত দেখছ না। লোকটি চলে গেলেন। পরক্ষণেই ওমর (রা.) চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি এলে ওমর (রা.) তার হাতে ঐ বেতটি দিয়ে বলেন, আমাকে আঘাত কর। আমি অন্যায়ভাবে তোমার উপর আঘাত করেছি। তুমি বদলা না নিলে আমার বিপদ হবে। আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিব। প্রত্যুত্তরে লোকটি বলল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিলাম। হযরত ওমর (রা.) পুরো ঘটনাটির ব্যাপারে লজ্জিত হলেন। অনুতপ্ত হলেন ভীষণভাবে। সাথে সাথে বাসায় চলে গেলেন। বাসায় গিয়ে প্রথমে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, হে ওমর! তুই একজন অসভ্য কমীনা ছিলি; আল্লাহ তোকে মর্যাদা দিয়েছেন। তুই একজন গোমরাহ পথভ্রষ্ট ছিলি; আল্লাহ তোকে হেদায়েত করেছেন; সঠিক সহজ-সরল পথে এনেছেন। তুই হীন নীচু ছিলি। আল্লাহ তোকে সম্মান দিয়েছেন; দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় খেলাফতের দায়িত্ব। এতদসত্ত্বেও এক লোক এসে বিচার প্রার্থী হলে তুই তাকে বেত্রাঘাত করলি। কাল হাশরের ময়দানে বিচার দিবসে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবি। কি উপায় হবে ঐ সময় তোর। এভাবে দীর্ঘক্ষণ নিজেকে তিনি তিরস্কার করতে থাকেন এবং আপন কৃতকর্মের জন্য খুবই লজ্জিত হতে থাকেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর গোলাম হযরত আসলাম বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে বের হলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর আমরা এক জনমানবহীন এলাকায় পৌছুলাম। সুদীর্ঘ ময়দান। কোথাও কোনো লোকজন নেই। এক কোণে নিভু নিভু আগুন জলছে, দেখা যায়। ওমর (রা.) বললেন, চল আমরা সেখানে যাই। হয়তো কোনো কাফেলা রাত হয়ে যাওয়ায় এখানে আটকা পড়েছে। গন্তব্যে পৌছতে পারেনি। নিশ্চয় কোনো অসুবিধায় আছে। চল যাই তাদের খোঁজখবর লই এবং তাদের সহযোগিতা করি। আমরা সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি এক মহিলা

ওমর (রা:) এর জামানায় এক মহিলা ও তার বাচ্চাদের ক্ষুধার ঘটনা



এবং কয়েকটি শিশু কাঁদছে। মহিলার সামনে একটি চুলায় আগুন জ্বলছে। চুলার উপর একটি ছোট্ট পাতিল বসানো। পাতিলের মুখ ঢাকা। এ অবস্থা আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম। হযরত ওমর (রা.) মহিলাকে সালাম দিলেন। অনুমতি চাইলেন কাছে যাওয়ার। মহিলা অনুমতি দিলে ওমর (রা.) সামনে অগ্রসর হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এই শিশুগুলো এভাবে কাঁদছে কেন? মহিলা বলল, জঠর জ্বালায়। ক্ষুধায় কাতর হয়ে এভাবে কাঁদছে। ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ পাতিলে কি? মহিলা বলল, পাতিলে পানি। আমি অসহায় এক অবলা নারী। আমার কোনো সহায়-সম্বল নেই। বাচ্চাদের কান্না সইতে পারি না আবার ওদেরকে কিছু খেতে দেওয়ারও সামর্থ্য আমার নেই। তাই পানি ভরে পাতিলটি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। আর ওদেরকে বলছি, খানা পাক হচ্ছে। একটু সবুর কর। উদ্দেশ্য হলো এভাবে ওদের মনে প্রবোধ দেওয়া এবং আশায় আশায় ঘুম পড়ানো। আমীরুল মু'মিনীন আমাদের দুরাবস্থার খবর নেননি। আমি কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হব। আল্লাহ সেদিন আমার এবং আমীরুল মু'মিনীনের মধ্যে অবশ্যই বিচার করবেন।

মহিলার এ স্পর্শকাতর কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) ভয় পেয়ে গেলেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু হলো আল্লাহ তা'আলার ভয়ে। অশ্রু সজল নয়ন আর কাতর কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন। ভালো, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। ওমর কি করে জানবেন তোমার এ দূরবস্থার কথা? কিভাবে খবর নিবেন তিনি। স্ত্রী লোকটি বিস্ময় ও ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, সে আমাদের আমীর হয়েছে, আমাদের অবস্থার খবর রাখবে না? এ কেমন কথা।

হযরত আসলাম (রা.) বলেন, এরপর ওমর (রা.) আর কোনো উত্তর করলেন না। আমাকে নিয়ে দরবারে চলে গেলেন। বায়তুল মাল– রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজ হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ আটা, খেজুর, চর্বি, কাপড় এবং বেশ কিছু দেরহাম নিয়ে একটি বস্তায় ঢুকালেন। এরপর বললেন– বোঝাটি আমার কোমরে উঠিয়ে দাও। আমি আরজ করলাম, আমীরুল মু'মিনীন! আমি নিয়ে চলি। উত্তরে বললেন– "না, আমার কোমরে উঠিয়ে দাও" এভাবে আমি দুই-তিনবার অনুরোধ করলাম বোঝাটি আমিই নিয়ে যাই আমীরুল মু'মিনীন! এবার জোর দিয়ে উত্তর দিলেন ওমর (রা.), এ বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে। কিয়ামতের দিন এজন্য আমাকেই প্রশ্ন করা হবে। অবশেষে বাধ্য হয়ে আমি বস্তাটি হযরত ওমর (রা.) -এর কোমরে তুলে দিলাম। অর্ধ জাহানের শাসক আটার বস্তা কোমরে নিয়ে অগ্রসর হলেন। ছুটলেন সেই ময়দানের দিকে। দ্রুত যেতে লাগলেন। সেখানে পৌছে নিজ হাতে

ছামান নামালেন। নিজ হাতে আটা গরম পানিতে ছেড়ে দেন। সাথে কিছু খেজুর ও চর্বি ঢেলে দেন এবং নিজেই পাকানো শুরু করে দেন। আগুন তেজ হলে পাক দ্রুত হবে এ জন্য চুলার মুখ দিয়ে বারবার ফুক দিতে থাকেন। এতে লাকড়ির চুলার ধোঁয়া তাঁর ঘন শ্মশ্রুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রান্না শেষে নিজে পরিবেশন করে সকলকে খাওয়ালেন। শিশু বাচ্চারা খাবার পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। আহার শেষে তারা খেলাধুলা করতে থাকে। অবশিষ্ট খাবারগুলো মহিলাকে বুঝিয়ে দিলেন। মহিলা তাঁর আচরণে মুগ্ধ হলেন এবং কৃতজ্ঞমন থেকে একটি কথা বেরিয়ে এল মহিলার, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। হযরত ওমরের পরিবর্তে তুমিই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলে। হযরত ওমর (রা.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি যদি খলীফার দরবারে যাও তাহলে সেখানে আমাকে দেখতে পাবে। এমনি ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর আল্লাহভীতি।

নামাজে দাঁড়িয়েও কাঁদতেন আল্লাহর ভয়ে। তাহাজ্জুদের সময় তো অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন।

## জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্দেশ মানা

খন্দকের যুদ্ধ। কাফেরদের প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক। মক্কার কাফেররা মুসলমানদের সাথে কুলিয়ে উঠছিল না। বারবার মার খাচ্ছিল। ফলে তারা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথে যোগাযোগ করল। পরামর্শ করল মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান উত্থান নিয়ে। মুসলমানদের উন্নতি-সমৃদ্ধি অমুসলিম জাতির জন্য অশনি সংকেত, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তাদের এ উত্থান দমাতে হবে। যে করেই হোক, বন্ধ করে দিতে হবে তাদের অগ্রযাত্রা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে তাদের একটি লিয়াজোঁ হলো। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি আক্রমণ করা হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত হামলা হবে। চালানো হবে সাঁড়াশি অভিযান। এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো তাদের। রাসূল ﷺ তাদের এ দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারেন। সিদ্ধান্ত নিলেন পরিখা খনন করে এ আক্রমণের মোকাবিলা করার। পরিখা খনন করা হলো। এদিকে কাফেররা জোটবদ্ধভাবে অগ্রসর হলো। যে কোনো সময় মদিনা আক্রান্ত হওয়ার ঘনীভূত আশঙ্কা রয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ সাহাবীদের (রা.) নিয়ে মোকাবিলার জন্য পরিখার দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে মুনাফিকরা অজুহাত পেশ করল। আমাদের বাসা বাড়িতে কেহ নেই। তাদের খোঁজ নেওয়া দরকার। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে আমাদের। রাসূল ﷺ অনুমতি দিলেন। তারা ফিরে গেল। এমনিভাবে যে-ই এসে ওজর পেশ



করল, হুজুর ﷺ তাকেই অনুমতি দিলেন। লোকজন কমে গেল। কাফেলা অগ্রসরমান সামনের দিকে। হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু। অন্ধকার ছেয়ে গেল। আঁধারের ঘনঘটা এত তীব্র ছিল যে, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমনকি ব্যক্তি তার নিজের হাত-পাও দেখতে পারছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে রাসূল ﷺ ঘুরে ঘুরে সকলের খবর নিচ্ছেন কে কি অবস্থায় আছে। ঘুরতে ঘুরতে একবারে আমার নিকট চলে এলেন। আমার অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। যুদ্ধের সমরাস্ত্র ছিল না; ছিল না কোনো যুদ্ধ সামগ্রী। এমনকি পর্যাপ্ত কাপড়ও ছিল না। স্ত্রীর ছোট একটি কাপড়ের টুকরা সাথে নিয়ে এসেছিলাম। টুকরা কাপড় দ্বারা কোনো মতে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে নিলাম এবং হাত-পা একসাথে করে মাটির সাথে মিশে বসে রইলাম। শীতে একেবারে কাতর। শরীর কম্পমান। এমন অবস্থায় রাসূল ﷺ আওয়াজ দিলেন, কে তুমি? উত্তর দিলাম, আমি হুজায়ফা। উঠে দাঁড়াও। হুজুর ﷺ -এর এ কথার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তোমাকে কাজ করতে হবে। শত্রু শিবিরে ঢুকে তাদের খোঁজ-খবর নিতে হবে। কি অবস্থায় তারা এখন সময় কাটাচ্ছে। কনকনে শীত, ঘন অন্ধকার ইত্যাদি উপেক্ষা করে চলে গেলেন গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে। সহায়-সম্বল কিছুই নেই। এর পরও রওয়ানা হলেন। রাসূল ﷺ দোয়া করছিলেন–

اَللّٰهُمَّ احْفَظْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ وَمِنْ فَوْقِهٖ وَمِنْ تَحْتِهٖ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি হুজায়ফাকে হেফাজত করুন। তার উপর-নীচ, ডান-বাম এবং সামনে-পিছে সকল কিছু থেকে।

রাসূল ﷺ -এর দোয়া নিয়ে তিনি চলে গেলেন। ঢুকে পড়লেন শত্রু শিবিরে। শত্রু শিবিরে ততক্ষণে ভয়-ভীতির ছায়া বিরাজ করছিল। ঘূর্ণিবায়ুতে পাথর উড়ে আসছে। উড়ে উড়ে তাঁবুতে পড়ছে। এদিকে প্রচণ্ড শীতের দরুন অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে আগুনের তাপ নিচ্ছিল লোকজন। আর আওয়াজ করছিল, ফিরে চল, ফিরে চল। কিছুদূর সামনে গিয়ে দেখা গেল আবূ সুফিয়ান আগুন পোহাচ্ছে। আবূ সুফিয়ান ছিল পুরো বাহিনীর সিপাহসালার। সময়টি উপযুক্ত মনে করে হযরত হুজায়ফা (রা.) তাঁর ধনুক প্রস্তুত করে নিলেন। 'গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কাউকে কোনো আঘাত করবে না' রাসূল ﷺ -এর এ আদেশের কথা মনে পড়ে গেল। সাথে সাথে তিনি বিরত হলেন। ইতোমধ্যে আবূ সুফিয়ান টের পেয়ে গেল। 'তোমাদের মধ্যে গুপ্তচর আছে" এই বলে চিৎকার দিয়ে উঠল এবং

পাকড়াওয়ের জন্য সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা একে অপরের হাত ধরে নাও। হযরত হুজায়ফা (রা.)ও একজনের হাত ধরে নিলেন। বিপদমুক্ত হলেন। ফিরে এসে সকল সংবাদ রাসূল ﷺ কে অবহিত করেন। রাসূল শুনে মৃদু হাসলেন এবং তাকে স্নেহ-মমতা দিয়ে দুঃখ ভুলিয়ে দিলেন।

## সাহাবীদের প্রশংসায় কুরআন-হাদীস

রাসূল ﷺ -এর সাহাবী হিসেবে, উম্মতের আদর্শ হিসেবে যত গুণাবলি প্রয়োজন ছিল সবগুলোই সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এমন কোনো উত্তম গুণ নেই, যা তাঁদের মধ্যে ছিল না। কয়েকটি মৌলিক গুণাবলি কুরআনের ভাষায়–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ـ

অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আর তাঁর সাথে যারা আছেন, তাঁরা কাফেরদের উপর কঠোর। পরস্পর বিনম্র [এই দৃষ্টি সম্পন্ন!] তাদেরকে দেখবে রুকূ'-সেজদা অবস্থায় তারা তালাশ করে তাদের প্রভুর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। [বেশি বেশি] সেজদার কারণে তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন পড়ে গেছে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَخْرَجَ رَزِيْنٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنِّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ الْحَىَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَاَعْمَقَهَا عِلْمًا وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا عَلٰى اٰثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উত্তম পথ অনুসন্ধান করে সে যেন মৃত্যুবরণকারীদের পথ অবলম্বন করে। কেননা জীবিতগণ ফেৎনার আশঙ্কামুক্ত নয়। আর ঐ সকল লোক হলো রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণ (রা.), তারা এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাদের অন্তর ছিল খুবই নেকপ্রবণ। ইলম ছিল খুবই গভীর। লৌকিকতা-ভণিতা ছিল নিতান্তই স্বল্প। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সাহচার্যের জন্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তাদের মর্যাদার কদর কর এবং তাদের



পদাংক অনুসরণ কর। যথাসম্ভব আঁকড়িয়ে ধর তাঁদের চরিত্র, তাঁদের অভ্যাস। কেননা তাঁরা ছিলেন সহজ-সরল সঠিক সুন্দর পথের উপর।

এ ধরনের উত্তম গুণাবলি ছিল নবীর সাহাবীদের। তাঁরা সদা-সর্বদা রাসূল ﷺ -এর সাথে থাকতেন। থাকার চেষ্টা করতেন। কাফেরদের ব্যাপারে, অমুসলিমদের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। দীনী ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দিতেন না তাঁরা। তবে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকতেন। নিজেদের মধ্যে কোন্দল ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতেন। সর্বোত্তম ইবাদত নামাজে ছিলেন পাকা। এত বেশি পরিমাণে নামাজ আদায় করতেন যে, তাদের কপালে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এ সকল কাজের মূল লক্ষ্য ছিল একটাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়া। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ পাওয়া। এমনিভাবে তাঁরা ছিলেন সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁদের অন্তরজ্ঞানের পরিধি ছিল সুগভীর, ব্যাপক। লৌকিকতা-ভণিতা ছিল না বললেই চলে। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে–

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি করলেন। মুহাম্মদ ﷺ -কে উত্তম পেলেন। তাই তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠালেন এবং নির্বাচন করলেন তাঁর ইলমের জন্য। পুনরায় মানব জাতির হৃদয়ের প্রতি তাকালেন, সাহাবীদের পছন্দ হলো। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে তাঁর দীনের সাহায্যকারী এবং স্বীয় নবীর পরামর্শদাতা স্থাপন করলেন। সুতরাং এই মুমিনগণ যে বস্তুকে মন্দ বলবে সেটাই মন্দ হবে।

## সাহাবাগণ (রা.) আল্লাহর সন্তোষভাজন

গোলাম যদি তার মনিবকে জয় করতে পারে; করে নিতে পারে নিজের প্রতি রাজি খুশি। যদি প্রভুর অকুণ্ঠ সমর্থন থাকে বান্দার কথা, কাজ ও আচরণের প্রতি। তাহলে বান্দা হিসেবে সে ব্যক্তি ধন্য, গর্বিত। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও ছিলেন এমনি এক ধন্য গোলামের জামাত। তাদের প্রতি তাদের প্রভু ছিলেন সন্তুষ্ট; তাদের সকল কথা, কাজ, আচার-আচরণের প্রতি ছিলেন রাজি। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই বান্দাদের সাফাই গেয়ে বলেন, তারাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট।

এরশাদ হচ্ছে–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থাৎ, মুহাজির এবং আনাসারদের প্রথম অগ্রগামী দল এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবহমান, সেথায় তারা চিরস্থায়ী। এটাই হলো মহান সফলতা।

-[সূরা তওবা, আয়াত : ১০০]।

এ আয়াতে কারীমায় সকল সাহাবীই শামিল আছেন।

সুধী পাঠক! মালিক তার গোলামের প্রতি সন্তুষ্ট। গোলাম তার মনিবের প্রতি সন্তুষ্ট। এক্ষেত্রে দূর থেকে, বহুদূর থেকে যদি কোনো দুর্ভাগা, পাপিষ্ঠ নাক গলানোর অপচেষ্টা চালায়। চালায় অপপ্রয়াস ছিদ্রান্বেষণের। তারা যে কতটুকু নীচ ও হীন প্রকৃতির লোক হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে অভিসম্পাত ঐ সাহাবা-শত্রুদের প্রতি যারা সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারল না, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও।

## নবীর পরেই সাহাবীদের স্থান

পথহারা পথভোলা মানুষ কি করে পথ পেতে পারে। আঁধারে ডুবে থাকা পৃথিবী কি করে আলোর দিশা পেতে পারে। পেতে পারে দিকনির্দেশনা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। বিভ্রান্ত জাতি সক্ষম হয় মুক্তির দিশা গ্রহণে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন রাসূল ﷺ কে। তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তার পূর্বে গত হয়েছে বহু নবী। সর্বশেষ রাসূল ﷺ -এর মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে নবুয়তের সমুদয় বিষয়। অন্যান্য নবীর মতো রাসূল ﷺ ও এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন। তবে থেকে যাবে তাঁর নীতি ও আদর্শ। এ নীতি ও আদর্শ লালন করার একটি প্রতিনিধি দল ছিল অপরিহার্য। যারা রাসূল ﷺ -এর রেখে যাওয়া দীনের এ আমানত সংরক্ষণ করবে। পৌঁছে দিবে পরবর্তী উম্মতের নিকট। রাসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায়ই এ প্রতিনিধিদল তৈরি করে যান। বুঝিয়ে দেন এ আমানত যথাযথভাবে। তাদের থেকে কদাচিৎ কোনো অসঙ্গত কিছু প্রকাশ পেলে কুরআনে করীমের ওয়াহীর মাধ্যমে তা শুধরিয়ে দিতেন আল্লাহ তা'আলা। আর এগুলো বাস্তবায়ন হতো স্বয়ং রাসূল ﷺ -এর তত্ত্বাবধানে। ফলে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, সাহাবায়ে কেরাম নবী-রাসূলগণের মতো 'মাসূম' না হলেও মাহফূজ তথা সংরক্ষিত অবশ্যই। সকল পাপ-পঙ্কিলতা আবিলতামুক্ত ছিলেন তারা। এসব থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছিলেন উম্মতের মাঝে আস্থাভাজন হওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনো জটিলতা দেখা না দেয়।



উম্মতের মধ্যে এমান মর্যাদা ও শান কারো নসিব হয়নি। সুযোগই আসেনি। এ ছিল কেবল রাসূল ﷺ -এর সোহবতপ্রাপ্ত একমাত্র দীনের ধারক, বাহক ও প্রতিনিধি দল। সুতরাং রাসূল ﷺ -এর পরবর্তীতে উঁচু মর্যাদায় আসীন হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ اَصْحَابِىْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ سِوَى النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاخْتَارَ مِنْ اَصْحَابِىْ اَرْبَعَةً يَعْنِىْ اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ وَقَالَ اَصْحَابِىْ كُلُّهُمْ خَيْرٌ۔

অর্থ- পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলগণের পর আমার সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চারজন অর্থাৎ আবূ বকর (রা.), ওমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.)। তবে সকলেই ভালো।

[কুরতুবী খণ্ড, পৃ: ২৯৭]

## সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

সাহাবা (রা.) -এর চরিত্র ছিল পুত ও পবিত্র। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি তাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল। পাপ পঙ্কিলতা থেকে তারা দূরে থাকতেন। কুফর নাফারমানির প্রতি ঘৃণা ছিল মজ্জাগত। এ সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ۔

অর্থাৎ, ঐসকল লোক যাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের হৃদয় পরীক্ষিত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের হৃদয় পরীক্ষিত। তাকওয়ার পাল্লায় পরীক্ষিত। জীবনের বহু ত্যাগ ও কুরবানি এসেছে তারা সেগুলোয় উত্তীর্ণ হয়েছেন সফলতার সাথে। বিপদে-আপদে-সুখে-দুঃখে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলেননি তাঁরা ক্ষণিকের জন্যও। জীবন মরণ অবস্থায়ও তারা বিচ্যুত হননি সত্য থেকে। তারা পরীক্ষিত। তাদের হৃদয় আল্লাহমুখী। আল্লাহর ভয় স্মরণ তাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন- وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার প্রসঙ্গটি তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে হেদায়েতের সনদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করেছেন ঈমানের। তাদের আকীদা

বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলার নিকট ছিল প্রিয়। আল্লাহ তা'আলা ছিলেন সাহাবীদের প্রতি নিরঙ্কুশ ভাবে সন্তুষ্ট। সেমতে তিনি তদের হেদায়েতের সনদ প্রদান করেন। এভাবে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে তোমাদের নিকট করেছেন প্রিয় এবং তিনি ঈমানকে তোমাদের হৃদয়ে শোভা সুন্দর করে দিয়েছেন। এবং তিনি তোমাদের নিকট ঘৃণ্য ও অপ্রিয় করে রেখেছেন কুফর পাপ এবং আল্লাহর নাফরমানিকে। -[সুরা হুজুরাত]

পিছনে দীর্ঘ একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে অনেক মানুষ অতিবাহিত হয়েছে। কিয়ামত অবধি আসবে বহু মানুষ। এদের মধ্যে নিরঙ্কুশ একমাত্র শ্রেষ্ঠতম জামাত হলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জামাত। কারণ সাহাবাগণ (রা.) রাসূলের পরশ পেয়েছেন। তত্ত্বাবধান ছিল আসমানি ওহীর। সেমতে তাদের সাথে অপরাপর উম্মতের তুলনা-ই হয় না। যদি সকল আউলিয়ায়ে কেরামের ছওয়াবের ভার এক পাল্লায় আর একজন সাহাবীর আমল অপর পাল্লায় রাখা হয়, সন্দেহ নেই, কোনো সংশয় নেই। অবশ্যই ভারি হবে সাহাবীর আমলের পাল্লা। এ কথা কুরআন হাদীস সমর্থিত। কুরআন-হাদীস স্বীকৃত। এ কথা সত্য। অবধারিত সত্য। কারো দ্বিধা সংকোচ থাকলে ঈমানে আঘাত আসবে। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۔

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে [সাহাবাগণ (রা.)] শ্রেষ্ঠতম উম্মতরূপে তৈরি করেছি। অপরাপর উম্মতের ক্ষেত্রে তোমরাই সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে।"

তিনি অন্যত্র আরো বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

জনসাধারণের [কল্যাণের] জন্য তোমাদের আত্মপ্রকাশ শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসেবে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আমরা জানি, সকলেই জানি। ভালো করে জানি। কুরআনে কারীম নাজিল হওয়ার প্রথম সম্বোধিত উম্মত ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। রাসূল ﷺ -এর নিকট সরাসরি কুরআন নাজিল হয়েছে। সুতরাং কুরআনের মুখাতাব সম্বোধিত উম্মত সাহাবাগণ



(রা.) ছাড়া অন্য কেউ নয় এবং হতেও পারে না। সাহাবাগণের কতিপয় গুণ আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۔

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুহাজির আনসার নির্বিশেষে সকলের প্রশংসা করে বলেন– মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তার সঙ্গি সহচর সাহাবাগণ জঙ্গি কাফেরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর। নিজেদের মধ্যে একে অন্যের দরদি। তুমি তাদেরকে আল্লাহর দরবারে রুকূ' সেজদায় রত দেখতে পাবে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য তারা সচেষ্ট। সেজদার ফলে তাদের চেহারায় তাদের পরিচয় সুস্পষ্ট। তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তাদের এ পরিচয় বিবৃত আছে।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। সুখে-দুঃখে সব সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ -এর পাশে থাকতেন। এ কাফেররের বিরুদ্ধে এবং জালেমের বিরুদ্ধে সাহাবাগণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কাফেরদের ব্যাপারে তারা কখনো আপস করতেন না। দীন কায়েমের জন্য সদা সজাগ ও সচেতন থাকতেন। তবে মুসলিম ভাই পরস্পরে ছিলেন বিনম্র। একে অপররের প্রতি সহানুভূতিশীল। একে অপরের বিপদে সাড়া দানকারী। কেউ কারো পিছনে লেগে থাকত না। কাউকে গালি দেওয়া, কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো কাজ তাদের থেকে সংঘটিত হতো না কোনো সময়। ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে থাকতেন সর্বদা। ইবাদত এত বেশি পরিমাণ করতেন যে, কপালে ইবাদতের আলামত ছিল সুস্পষ্ট। চেহারা দেখলেই ইবাদতের আলামত প্রস্ফুটিত হতো। তারা ইবাদত করতেন– শুধু ফরজ ইবাদত নয়। নফল সুন্নত নির্বিশেষে সকল ইবাদত। দিনে রাতে সব সময়। বিশেষ করে-গভীর রাতে। বিনিদ্র রজনী কাটাতেন প্রতিনিয়ত। মধ্য রাত্রির পর থেকেই তারা বিছানা ছেড়ে দিতেন। উঠে যেতেন। উঠে যেতেন আল্লাহর মহব্বতে। আল্লাহর ভালোবাসায়। দাঁড়িয়ে যেতেন নামাজে। বিরামহীন নামাজে কোনো অস্থিরতা ছিল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۔

"তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে। তারা তাদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে। এবং তারা খরচ করে আমার প্রদত্ত রিজিক হতে।"

## সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ওয়াজিব

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ ......... اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

সাহাবীগণ (রা.) সব সময়ই সমালোচনার উর্ধ্বে। তাদের চরিত্র পবিত্র। তাই তাদের সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তাদের সমালোচনা ব্যক্তির জন্য ধ্বংসের কারণ। সাহাবা (রা.) -এর সমালোচনা নিষেধ করে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ আমার সাহাবাগণ (রা.)-এর সমালোচনা করো না। মনে রেখ! আল্লাহর পথে তাদের যে কেউ মুষ্টিমেয় যবও দান খয়রাত করেছে। তোমরা ভুবন ভরা স্বর্ণরৌপ্য দান করেও তাদের দেওয়া সেই এক মুষ্টি যবের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। -[তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, যদি দেখ কেউ আমার সাহাবীদের সমালোচনা করছে তবে বল তোমাদের এ জঘন্য কাজে আল্লাহর অভিসম্পাত।

সিরাতের প্রসিদ্ধ কিতাব শিফার্তে উল্লেখ আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন- اِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِىْ فَاَمْسِكُوْا আমার সাহাবীদের আলোচনাকালে সংযত থেকো।

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَ اَصْحَابِىْ عَلٰى جَمِيْعِ الْعٰلَمِيْنَ مَنْ حَفِظَ فِىْ اَصْحَابِىْ كُنْتُ لَهٗ حَافِظًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থাৎ, আমার সাহাবাদের [মান-সম্মান] যে হেফাজত ও সংরক্ষণ করবে কিয়ামতের দিবসে আমি তার হেফাজত ও সম্মান রক্ষা করব।

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন- যে আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আমার কথা রাখবে সে কিয়ামত দিবসে হাউযে কাউসারে আমার কাছে আসবে। পক্ষান্তরে যে আমার কথা রাখবে না সে আমার কাছে উপস্থিত হতে পারবে না। -[শিফা : ২য় খণ্ড]

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) তদীয় গ্রন্থ اَلْاِصَابَةُ ১ম খণ্ডে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ আবূ যুরআ (রা.) -এর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করেন-

اِذَا رَاَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ زِنْدِيْقٌ -

যখন কাউকে দেখবে যে, কোনো একজন সাহাবারও অবমাননা করছে তখন তাকে নির্ঘাত জিন্দিক বা অমুসলমান বলে জানবে।



উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে কোনো মুসলমান সাহাবীদের সমালোচনা করতে পারে না। কিভাবে পারবে। তার ইসলাম ঈমান তো এসেছে সাহাবীদের কল্যাণেই। তাদের ত্যাগের বিনিময়েই তো আজকে তিনি মুসলমান। তার এই মুমিন হওয়ার ভিত রচনা হয়েছে এই সাহাবীদের উপর। সুতরাং কিভাবে ঐ মুমিনের মুখ থেকে ত্যাগী মিত্রদের সমালোচনা বের হবে। তদুপরি যদি কোনো দু'র্ভাগা নামধারী মুসলমান সাহাবীদের সমালোচনা করে। চৌদ্দশত বছর পর এসে তাদের দোষ ধরার ধৃষ্টতা দেখায়। তাহলে বুঝতে হবে এখানে কোনো রহস্য আছে। হয় সে যিন্দিক। নতুবা মুনাফিক। কোনো নির্বোধ, নাদান যে ইসলাম সম্পর্কে জানে না, সাধারণ পর্যায়ের মুসলমান আর যাই হোক সাহাবীদের সমালোচনা করতে পারে না।

হযরত বারিদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- যে জনপদে আমার কোনো সাহাবীর ইন্তেকাল হলো ঐ জনপদবাসীর পক্ষে আমার ঐ সাহাবী কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করবে।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত- রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্বাচিত করেছেন। আর আমার জন্য আমার সাহাবীদের মনোনীত করেছেন। তাদেরকে আমার সাহায্যকারী এবং ঘনিষ্ঠ করেছেন। শেষ জমানায় এমন একটি গ্রুপের আবির্ভাব হবে যারা সাহাবীদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানবে। সাবধান! তোমরা তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদী, নামাজ আদায় করবে না। এমনকি তাদের জানাযায়ও অংশগ্রহণ করবে না।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন- বৃক্ষের নিচে যারা আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে তারা কখনো জাহান্নামে যাবে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবীদের অবস্থা দেখে বলেন- তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।

## জাগতিক বিষয় তাদের হাতে ছিল অন্তরে নয়

জাগতিক প্রসঙ্গ প্রয়োজন, মানবিক চাহিদা তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি। অস্থি মজ্জায় ঢুকেনি পার্থিব বিষয়। বৈষয়িক সব কিছুকে তারা প্রয়োজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজন অনুপাতে গ্রহণ করেছেন। চিন্তা-চেতনার মূল আকর্ষণ জাগতিক বিষয়ের প্রতি ধাবিত করেননি। পূর্ণ মনোযোগসহ মনোনিবেশ করেননি

দুনিয়ার প্রতি। হৃদয়ের প্রবণতা ছিল আখেরাতমুখী। পরকালমুখী। দুনিয়াকে অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। স্থায়ী ঠিকানা মনে করতেন জান্নাতকে। পরকালীন ঠিকানাকে অনন্ত জীবনের ঠিকানা হিসেবে বিশ্বাস করতেন। গ্রহণ করেছিলেন, মেনে নিয়েছিলেন শেষ ঠিকানা হিসেবে জান্নাতকে।

জীবন উপকরণ হিসেবে কিছু মিললে– শুকরিয়া আদায় করতেন। শুকরিয়া আদায় করতেন মুখে, কাজে, কর্মে। হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতেন আল্লাহর প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাতেন আপাদমস্তক নতশীরে। সেজদায়ে শোকরানার মাধ্যমে নজরানা পেশ করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আর কিছু না পেলে। সবর করতেন, ধৈর্য ধরতেন। পেটে ক্ষুধা আছে। তবে মুখে ছওয়াল নেই, যাঞ্ছা নেই। অভাব ছিল। অনটন ছিল। অন্ন বস্ত্রের সমস্যা ছিল। ইবাদতে কমতি ছিল না। কিয়ামুল লাইল ঠিকই চলত। নিশি জাগরণ জ্ঞান অন্বেষায় ভাটা ছিল না। গভীর রজনীতে রোনাজারী ছিল মর্মভেদী। রোদনের প্লাবন ছিল উত্তাল। নয়ন জলে চোখ-নাক মুখ একাকার হয়ে যেত। কান্না করতেন আল্লাহর দরবারে, প্রভুর দরবারে। ইলমের অন্বেষায়। মুক্তি কামনায়। চেহারায় ছিল সকরুন অভিব্যক্তি। খেয়াল করলে মনযোগ দিলে- বুঝা যেত। অনুভব করা যেত তাদের কাতরতার আলামত। উপলব্ধি করা যেত তাদের দুরবস্থা। স্বাভাবিক নজরে তাদেরকে স্বচ্ছল প্রসন্ন-ই মনে হবে, তাদের সম্পর্কে যারা জানতো তারা এমনি ধারণা করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

অর্থাৎ, ঐ সকল দরিদ্রের জন্য, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। তারা জমিনে বিচরণে সক্ষম নয়। অজ্ঞরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করত। তোমরা চিনবে তাদের আলামত দেখে। তারা নাছোর বান্দা হয়ে মানুষের কাছে কোনো কিছু চায় না।

## মুহাজিরদের পরিচয়

হিজরত শব্দ হতে মুহাজির শব্দ উদ্ভূত। এর অর্থ হলো ত্যাগ করা। ইসলামি পরিভাষায় মুহাজির বলা হয় যারা ইসলামি বিধান সঠিকভাবে পালন করার উদ্দেশ্য স্বদেশ ত্যাগ করে তদেরকে মুহাজির বলা হয়। কেউ বলেছেন, যারা মক্কায়



ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে কুরাইশদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে আবিসিনিয়া ও মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে মুহাজির বলা হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ মক্কার কুরাইশদের নির্যাতনের ষ্টিম রোলারে নিষ্পেসিত হয়ে স্বদেশ মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও এরপর মদিনায় হিজরত করেন তাঁরাই মুহাজির হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

## আবিসিনিয়ায় মুহাজির

কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল। মক্কায় ইসলামের নির্দেশাবলি সুষ্ঠুভাবে পালন করা ছিল অসম্ভব। তখন মহানবী ﷺ প্রিয় সাথীদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। মহানবী ﷺ -এর নির্দেশ অনুসারে প্রথমে ১১ জন পুরুষ ও চার জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। তারা নবুয়তের ৫ম সালের রজব মাসে যাত্রা করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে লোহীত সাগরের বন্দরে উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন দুটি মালবাহী জাহাজ আবিসিনিয়ায় যেতে প্রস্তুত হয়েছে। জাহাজের অধিনায়ক অল্প ভাড়ায় তাদেরকে উঠিয়ে নিল। তাদের কেবল মাথাপিছু ৫ দেরহাম দিতে হয়েছিল। কুরাইশরা এ হিজরতের খবর জানতে পেরে পিছু ধাওয়া করে নৌবন্দরে এসে দেখল যাত্রীরা চলে গেছে।

উল্লেখ্য যে, আবিসিনিয়া কুরাইশদের প্রাচীন ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। আবিসিনিয়ার শাসনকর্তাকে নাজ্জাশী বলা হতো। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাজ্জাশীর কারণে মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশগণ এ সংবাদে জ্বলেপুড়ে মরছিল। পরিশেষে তারা নাজ্জাশীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুসলমানদের ফেরত চাইল। এর ফলে যে সকল ঘটনার অবতারণা হলো তাতে স্বয়ং নাজ্জাশীর উপর ইসলামের প্রভাব পতিত হলো। একপর্যায়ে নাজ্জাশী মুসলমানদের ফেরত পাঠানোর আবেদন নাকচ করে দেন।

ইতোমধ্যে কোনো এক বিদেশী শত্রু আবিসিনিয়ায় আক্রমণ করে বসে। নাজ্জাশী স্বয়ং যুদ্ধে গমন করেন। এ সময় মুহাজিরদের কেউ কেউ এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কয়েক দিন যুদ্ধের পর নাজ্জাশী বিজয়ী হন। এভাবে বেশ কিছুকাল মুহাজিরগণ সেখানে শান্তিতে বসবাস করেন। এমন সময় সংবাদ রটে যে মক্কার কুরাইশগণ ইসলাম কবুল করেছে। এ সংবাদ শুনে অধিকাংশ মুসলমান মুহাজির মক্কার দিকে রওনা করেন। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন

এ খবর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাই তাদের কতিপয় লোক পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আর কিছু লোক চুপে চুপে মক্কায় প্রবেশ করেন। কিন্তু যারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তাদের উপর মক্কার কুরাইশগণ অকথ্য নির্যাতন শুরু করে দেয়। ফলে একান্ত অতিষ্ট হয়ে তারা পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হন। এরপর মহানবী ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়া হতে মদিনায় চলে আসেন। অবশিষ্টদেরকে মহানবী ﷺ হিজরি ৭ম সালে মদিনায় ডেকে নেন।

## মদিনায় মুহাজির

যখন মহানবী ﷺ ও সাহাবাগণ মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন ও অত্যাচারের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেন। এমতাবস্থায় ওহীর মাধ্যমে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ পেলেন। তাই তিনি সাহাবাদেরকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়ার পর অতি গোপনে হিজরত শুরু হয়েছিল। হিজরত করা কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। যে ব্যক্তি হিজরত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন কুরাইশরা তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। যাতে কেউ হিজরত করতে না পারে। সেজন্য তারা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যেত। কারণ যদি মুসলমান হিজরত করে অন্যত্র চলে যায়। তাহলে তারা অত্যাচার ও নির্যাতনের মিশন কিভাবে কার্যকর করবে। এছাড়া তারা ভাবতো মুসলমানগণ যদি অন্যত্র চলে যেতে পারে তাহলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে কুরাইশদের উপর আক্রমণ করতে পারে।

তবু কাফেরদের চোখের আড়ালে মুসলমানগণ গোপনে মদিনায় হিজরত করতে লাগলেন। যাদের হিজরতের ব্যাপারে কাফেররা জানত সঙ্গে সঙ্গে তারা কঠিন ও নির্মম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। মহানবী ﷺ এর দুধভাই হযরত আবু সালামা (রা.) তার স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ হিজরত করার ইচ্ছা করলেন এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র উটের পিঠে রাখলেন এবং স্ত্রী ও সন্তানদের আরোহণ করালেন। এমতাবস্থায় কুরাইশরা তার হিজরতের সংবাদ পেয়ে হযরত উম্মে সালমা ও তার সন্তানকে উটের পিঠ হতে নামিয়ে বলল, এরা আমাদের সন্তান। তুমি এদের নিয়ে যেতে পারবে না। উটের পিঠের আসবাবপত্র রেখে দিয়ে বলল, এগুলো আমাদের দেশের সম্পদ। তাই এ সব নিয়ে যেতে দেব না। নিরুপায় আবু সালমা ইসলামের আকর্ষণে অন্য সব কিছু ছেড়ে একাই হিজরত করেছিলেন। এভাবে মুসলমানগণ একে একে মদিনায় হিজরত করতে লাগলেন।



মক্কার কাফের নেতারা অনুধাবন করতে লাগল যে আস্তে আস্তে কোলাহলপূর্ণ মক্কা খালি হতে চলেছে। এক এক করে মদিনার পথে রওয়ানা হচ্ছে মুসলমানগণ। মক্কায় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হতে লাগল। অধিকাংশ মুসলমান হিজরত করে চলে গেলেন। অবশেষে মহানবী ﷺ ও মদিনায় হিজরত করার প্রত্যাদেশ পান। এবং তিনি হিজরত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।

এদিকে কুরাইশ দেখল যে, মুসলমানগণ মদিনায় গিয়ে শক্তি অর্জন করছে এবং ইসলাম ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। তখন তারা মহানবীকে হিজরত করতে না দিয়ে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তার অপার মহীমায় মহানবীকে নিরাপদে মদিনায় পৌছে দেন।

মুহাজিরগণ মদিনায় পৌছে আনসারদের অন্তরঙ্গ মেহমানে ও রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হন। আনসারগণ মক্কা হতে আগত মুহাজিরদেরকে দারুন আতিথেয়তা প্রদর্শন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

## আনসারদের পরিচয়

আনসারগণ ছিলেন মূলত ইয়েমেনের অধিবাসী। তারা কাহ্তান বংশোদ্ভূত। ইয়েমেনে যখন সর্বগ্রাসী বন্যা দেখা দেয় যাকে সায়েলে আরম বলে, ঐ সময় এই লোকেরা ইয়েমেন ছেড়ে মদিনায় এসে বসবাস করতে থাকেন। তারা ছিল দুই ভাই। এদের একজন হলেন আউস এবং অপরজন হলেন খাজরাজ। সকল আনসার এই দুই গোত্রের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তারা যখন মদিনায় আগমন করেন তখন সেখানে ও তার আশপাশের এলাকায় ইহুদিদের প্রভাব ছিল। ইহুদিরা ধনসম্পদের অধিকারী ছিল। পরবর্তীতে তারা ২০/২১টি গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আনসারগণ কিছুদিন ইহুদিদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকেন। কিন্তু ইহুদিদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যতার কথা বিবেচনা করে আনসারগণ তাদের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আনসারদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে ইহুদিরা শঙ্কিত হয়ে মৈত্রী চুক্তি বাতিল করে দেয়।

মদিনা ছিল তখন গাসসানী বংশের শাসনাধীন। এদের রাজা ছিলেন আবু জাবাল্লাহ। তিনি একদা এক বৃহৎ সেনাদল নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হয়ে আওস ও খাজরাজ বংশের সর্দারদেরকে উপঢৌকন ও উপহার বিতরণ করলেন। তারপর ইহুদি সর্দারদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অতি কৌশলে এক এক করে তাদের নির্মমভাবে নিধন করলেন। ফলে ইহুদিদের শক্তি খর্ব হয়ে গিয়ে আনসারদের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। ইত্যবসরে আনসারগণ মদিনা এবং তার আশেপাশে অনেকগুলো ছোট দুর্গ

নির্মাণ করে। তখন পর্যন্ত আউস এবং খাজরাজ একতাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে আরবদের স্বভাব অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং পরস্পর ভীষণ রক্তপাত ঘটে। বুগাস নামক সর্বশেষ যুদ্ধে উভয় বংশের নামজাদা লোকেরা যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করে। ফলে আনসারগণ এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তারা কুরাইশদের মিত্র হওয়ার আবেদন জানায়। কিন্তু আবু জাহল তা নাকচ করে দেয়।

আনসারগণ প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিল। ইহুদিদের সাথে তাদের সংহিত ছিল। এজন্য নবুয়ত ও আসমানি কিতাবের কথা তারা শুনেছিল। আনসারগণ ছিল জ্ঞান-বুদ্ধিতে পশ্চাদপদ। তাই তারা ইহুদিদের জ্ঞান গরিমার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করত। এর ফলে আনসারগণও প্রত্যাশিত নবী-আগমনের কথা ও তার নাম ধাম জানত। আনসারদের মাঝে শুয়াইদ বিন মাসিত নামক একজন কবি ও বীরযোদ্ধা ছিল। সে হযরত লুকমানের উপদেশাবলি নামক একটি গ্রন্থ হস্তগত করেছিল। সে ঐ কিতাবকে আসমানি কিতাব মনে করত। লোকটি একবার হজ করতে এসে মহানবী ﷺ -এর কথা শুনলেন এবং তার কাছে গিয়ে লুকমানের উপদেশ পাঠ করে শুনালেন। রাসূলে কারীম ﷺ তাকে বললেন, আমার নিকট তার চেয়ে উত্তম জিনিস আছে। তারপর হযরত রাসূল ﷺ পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত শুনালেন, লোকটি বিমোহিত হন। ফলে ইসলামের সত্যতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। পরবর্তী সে বুয়াস যুদ্ধে মারা যায়। সুয়াইদের ইসলাম প্রীতির কথা আনসারদের মাঝে পরিব্যাপ্ত ছিল। আউস এবং খাজরাজ বংশের যুদ্ধে যখন আউস গোত্র পরাজয় বরণ করে তখন তাদের নীতিনির্ধারক কুরাইশদের মিত্র হওয়ার জন্য মক্কায় গমন করে মহানবী ﷺ তাদের আগমনের কথা শুনে তাদের নিকট গিয়ে পাক কুরআনের কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। এতে আরাফ বিন মায়াজ ও অন্যান্যদের উপর ইসলামের প্রভাব পড়ে। কিন্তু কাফেলার সর্দার আবুল হায়েবের বিরোধিতায় তারা তখন মনোভাব প্রকাশ করেনি।

মহানবী ﷺ -এর দস্তুর ছিল তিনি হজের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রপতি ও নবাগতদের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। নবুয়তের দশম সালে সাধারণ নিয়ম মোতাবেক মদিনায় খাজরাজ বংশের কতিপয় লোক দেখে তাদের নিকট ইসলামের বাণী শুনান। ফলে তারা আকাবার সন্নিকটে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৬/৮ জন। এরাই ছিলেন আনসারদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দল। তারা মদিনায় গিয়ে ইসলামের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন।



পরের বছর মদিনা মুনওয়ারা হতে ১২ জন লোক মক্কা আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। একই সাথে তাদের আগ্রহে ইসলামের নীতি ও আর্দশ শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবী ﷺ মুসআব বিন ওমায়ের (রা.) কে মনোনীত করেন। তিনি মদিনায় গমন করে আনসারদের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। ওয়ায়েল ওয়াসিক গোত্রের কতিপয় পরিবার ছাড়া সকলেই ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছিল। আউস গোত্রের সর্দার সা'দ বিন মাআজ প্রথমে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কুরআনের কতিপয় আয়াত পাঠ করে শুনালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে অন্যান্য সর্দাররাও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। পরের বছর হজের সময় ৭২ জন লোক মক্কায় গমন করে মহানবী ﷺ -এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা মহানবী ﷺ কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

## আনসার নামকরণ

মুসলমানগণ যখন কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মহানবী ﷺ -এর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করলেন। সাথে মহানবী ﷺ নিজেও হিজরত করলেন। তখন মুসলমানগণ তাদের গৃহে আশ্রয় নেন। আনসারগণ তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুহাজির মুসলমানদেরকে সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেন। ফলে আনসারদের অন্ন-বস্ত্র ভূ-সম্পত্তিতে মুহাজিরদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন উদারতা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

মহানবী ﷺ -এর সাথে আনসারগণ যে ওয়াদা করেছিলেন তা তারা আমরণ পালন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাই পবিত্র কুরআন এদের ভূয়সী প্রশংসা ও মুক্তির পয়গাম সংবলিত আয়াত অবতীর্ণ করেছে।

আনসার ও মুহাজির পরস্পরে সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদ ও জীবনমরণের সাথী হয়ে এক সাম্য ভ্রাতৃমণ্ডলী ভুক্ত হলেন। আনসারগণ জগতে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সাম্য ভ্রাতৃত্বের এক অতুল আদর্শ ও অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন।

আনসার শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সাহায্য সহযোগিতাকারী। পরিভাষায় বলা হয় যারা মক্কা হতে দেশান্তর হয়ে আগত মুহাজিরদেরকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেছিল এবং মহানবী ﷺ ও ইসলামের জন্য সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তাদেরকে আনসার বলা হয়ে থাকে।

## সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি

হেদায়েতের পথ, কল্যাণের পথ সহজসাধ্য করার জন্য একটি নমুনার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল একটি বাস্তব আদর্শের। এজন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -কে পাঠিয়েছেন। তিনি ছিলেন কুরআনে কারীমের বাস্তব নমুনা। বিধানের দিক থেকে কুরআনে করীম হলো সংক্ষিপ্ত। তাই রাসূল ﷺ -এর একক সত্তার মধ্যে এর নমুনা রূপায়ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে কুরআনে কারীমের যথাযথ অনুধাবন হাদীসের সাহায্য ছাড়া ছিল অসম্ভব। হাদীসের ব্যাখ্যা না হলে কুরআনে কারীমের উপর আমল করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। যেমন কুরআনে আছে নামাজ আদায়ের বিধান। أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ যার অর্থ হলো নামাজ কায়েম কর। কিন্তু নামাজ কিভাবে আদায় করবে। এর পন্থা কি হবে। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে কোনো স্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে হাদীসে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। যা না হলে صَلٰوة -এর উপর আমল করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। এই তো ছিল কিতাব তথা বর্ণনার পর্যায়। নমুনার বিষয়টিও হুবহু এমনি। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) না হলে রাসূল ﷺ -এর আদর্শের বাস্তব নমুনা রেখে যাওয়া ছিল অসম্ভব। যেমন ছাত্র-উস্তাদ, মুরীদ-মুর্শিদের ব্যাপারটি ধরে নেওয়া যাক। একজন উস্তাদ ছাত্রের প্রতি কেমন দরদি হবেন। মুর্শিদের আচরণ কিরূপ হবে তার মুরীদের প্রতি। কথাবার্তা কিভাবে বলবেন। এগুলোর নমুনা তো রাসূল ﷺ থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু একজন ছাত্র তার উস্তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করবে। ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিমাণও ধরন কি হবে। মুরীদ তার মুর্শিদের প্রতি কতটুকু উৎসর্গিত হবে ইত্যাদি। এগুলোর দৃষ্টান্ত, নমুনার জন্য প্রয়োজন ছিল সাহাবাদের। কারণ এগুলোর বাস্তব রূপায়ণ রাসূল ﷺ -এর পক্ষে ছিল অসম্ভব। কারণ পৃথিবীতে তো তার কোনো উস্তাদ নেই। নেই কোনো মুর্শিদ। তাহলে কিভাবে তিনি এর বাস্তব নমুনা রেখে যাবেন। অবশ্য সাহাবাদের মাঝে যে আদর্শ ও নমুনা ফুটে উঠেছে তাও রাসূল ﷺ -এর দিকনির্দেশনায়-ই হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর তত্ত্বাবধানই ছিল এক্ষেত্রে মূল নিয়ামক।

### কুরআনের আলোকে

সাহাবীদের কাজের বাস্তব নমুনা যেন উম্মত অনুসরণ করে মনে-প্রাণে, ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে। কোনো রূপ দ্বিধা-সংকোচ যেন উম্মতের মধ্যে না থাকে। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আয়াতে সাহাবাদের প্রশংসা করেছেন। বর্ণনা করেছেন তাদের উঁচু মর্যাদা ও শানের কথা। বলে দিয়েছেন



প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়াতের দ্বারা তাদের আদর্শ অনুসরণের কথা। সত্যের মাপকাঠিরূপে তাদের গ্রহণ করার কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিচ্ছেন তার বান্দাদেরকে সহজ সরল পথ প্রার্থনার কথা। ইরশাদ হচ্ছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থাৎ, আমাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করুন। ঐ সকল লোকদের অনুসৃত পথ যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন। অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের পথ নয়।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতের হেদায়েতের, কল্যাণের রাস্তা বাতলিয়ে দিয়েছেন। শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত করেননি। আরেকটু সামনে বেড়ে বলেছেন, ঐ পথ, যে পথের লোকেরা আমার অনুগ্রহভাজন। এ আয়াতে স্পষ্ট নয় কারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহভাজন। তাই অন্য আয়াতে এর ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ـ

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম এবং তার রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।

সুধী পাঠক! সিদ্দীক বলে যারা দীনকে গ্রহণ করে নিয়েছেন অকপটে, সোৎসাহে, সাগ্রহে সানন্দে। আর সিদ্দীকের মধ্যে প্রথম ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। এমনিভাবে শহীদদের মধ্যে প্রথম কাতারের অধিকারী নিশ্চিতভাবে সাহাবাগণ। কারণ তারা স্বয়ং রাসূল ﷺ -এর সাথে থেকে জিহাদ করেছেন। তাঁর দিকনির্দেশনায়, তার প্রত্যক্ষ রাহনুমায়ীতে লড়েছেন এবং তারই চোখের সামনে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে সাইয়্যেদুশ শুহাদা-এর [শহীদদের সর্দার] মর্যাদা লাভ করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হামযাহ (রা.)। এমনিভাবে সালেহ সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যেও যে নিঃসন্দেহে প্রথম দল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। এতে কারো কোনো বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ নেই। থাকতেও পারে না। প্রমাণিত হলো আল্লাহর অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে নবীদের পরে সবচেয়ে উত্তম ও অগ্রগামী দল হলো সাহাবায়ে কেরামের জামাত।

অতএব, বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা নবী ও সাহাবীদেরকে হেদায়েতের রাস্তার মাপকাঠিরূপে বর্ণনা করে দিচ্ছেন। অন্যত্র ইরশাদ করেন–

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ -

অর্থাৎ, অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মতো, তবে তারা অবশ্যই সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা-ই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট।

–[সূরা আল বাকারা : আয়াত– ১৩৭]

একথা সকলেই জানে। ভালো করেই জানে। কুরআনে কারীমের প্রথম মুখাতাব [সম্বোধিত] হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ঈমান গ্রহণ করার মাপকাঠিরূপে আখ্যা দিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ঈমানকে।

এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْآ اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয় লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে আমরাও কি বোকাদের মতোই ঈমান আনব। মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে তারা-ই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে না। –[সূরা-বাকারাহ : আয়াত– ১৩]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐ সময় কেবল সাহাবাগণই ঈমান এনেছিলেন। এজন্যে মুফাসসিরীনে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো 'লোক' বলতে এখানে সাহাবাগণই উদ্দেশ্য। সুতরাং কুরআনের এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো সাহাবাদের পথই হলো উম্মতের একমাত্র অনুসৃত পথ। এছাড়া কোনো উপায় নেই, গত্যন্তর নেই।

## হাদীসের আলোকে

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সত্যের মাপকাঠি। তাদের অনুসৃত পথ-মতই একমাত্র আদর্শ। তাদের অনুসৃত রীতিনীতিই উম্মতের রীতিনীতি। একথা কুরআনে যেমন আছে তেমনি হাদীসেও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কিছু হাদীস পেশ করা হলো।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা যারা আমার পরে দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে। তখন বিভিন্ন মতবিরোধের সম্মুখীন হবে। তখন তোমরা আমার ও



খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নত আঁকড়ে ধরবে এবং বিদ'আত– কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ কুসংস্কারমাত্র-ই ভ্রষ্টতা। –[আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ]

উক্ত হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে উম্মতের ক্রান্তিলগ্নে রাসূল ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদা তথা চার খলীফার সুন্নত অনুসরণ করলে মুক্তি পাওয়া যাবে।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি নিজ কানে শ্রবণ করেছি যে, একদা রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন তার ইন্তেকালের পর সাহাবীদের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করে। আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনার জবাবে হযরত জিব্রাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার সাহাবিগণ (রা.) আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রসম। তাদের পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক আলো কম বেশি থাকলেও সকল নক্ষত্রেই ঝলমলে আলোকছটা বিদ্যমান। সুতরাং যে কেউ তাদের মতপার্থক্যের যে কোনো অভিমতই গ্রহণ করুক সে আমার কাছে সঠিক পথের অনুসারী হিসেবে গণ্য হবে। –[মেশকাত]

এ হাদীসে কুদসীর ভিত্তিতে রাসূল ﷺ বলেন–

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ -

আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রসম, তাদের মধ্যে যে কাউকে অনুসরণ করবে হেদায়েত পেয়ে যাবে।

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– বনী ইসরাঈলের ৭২ টি ফেরকা হয়েছিল। আমার উম্মতের মধ্যে হবে ৭৩ টি ফেরকা। সকল ফেরকা-ই হবে জাহান্নামী একটি ব্যতীত। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতী সেই ফেরকা কোনটি? রাসূল ﷺ বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথের উপর আছি সে পথের অনুসারী হবে যারা।

অন্যত্র ইরশাদ করেন– হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, কোনো মুসলমান যে আমাকে দেখেছে বা আমার সাহাবীকে দেখেছে তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না। –[তিরমিযী শরীফ : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা– ২৩১]

ইজমার আলোকে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। একথা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যুগে যুগে সকলেই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র.) তার খেলাফতকালে সাহাবীদের মানগত অবস্থান প্রসঙ্গে নীতি-নির্ধারণী কিছু বক্তব্য রাখেন। নিম্নে সারসংক্ষেপ পেশ করা হলো–

তোমাদের (উম্মত) জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য। তারা ছিলেন সকল দিক থেকে তোমাদের চেয়ে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তারা যে সীমারেখায় ছিলেন ইলম-জ্ঞানের আলোকেই ছিলেন এবং মানুষকে যা থেকে বিরত রেখেছেন সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই রেখেছেন। জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধানে তারাই ছিলেন নিঃসন্দেহে পরিপক্ক। ইসলাম ও দীনী বিষয়ে তারাই হলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আর যদি বল যে, তোমাদের পথই হেদায়েতের পথ। তবে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, তোমরা সাহাবীদের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব। দীনের ক্ষেত্রে [নতুন কোনো প্রসঙ্গ টেনে] যদি বল এ সকল বিষয়ে তাদের দিকনির্দেশনা নেই, তাহলে মনে রেখ ঐ নতুন বিষয়ের উদ্ভাবকরা সাহাবাদের মত ও পথ থেকে বিচ্ছিন্ন। কেননা দীনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণই হলেন অগ্রবর্তী। এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা রয়েছে। তাদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র থেকে সকল ব্যাধির উপশম সম্ভব এবং এটাই একমাত্র উপায়। সুতরাং তাদের অনুসৃত পথ ও পন্থায় সংযোজন ও বিয়োজনের কোনো অবকাশ নেই। একদল সংযোজন করতে গিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। আরেক দল বিয়োজন করতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন উভয় প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী সহজ সরল পথের অনুসারী।

খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের উপর সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। উসূলে হাদীস ও আকায়েদের প্রায় সকল কিতাবেই সাহাবাদের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইজমা বর্ণিত হয়েছে। আকায়েদ শাস্ত্রের কিতাবে সাহাবীদের ব্যাপারে ইজমা সম্বলিত মূল কথাটি হলো– "সকল সাহাবীগণ (রা.) ন্যায়পরায়ণ"।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা হাফেজ তকীউদ্দীন ইবনে সালাহ বলেন, সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি অনুসন্ধান করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা তাদের ন্যায় পরায়ণতা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সুপ্রমাণিত।



## যুক্তির নিরিখে সত্যের মাপকাঠি

সাহাবীগণ (রা.) হলেন রাসূল ﷺ ও তাঁর সাধারণ উম্মতের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। দীন শরিয়তের তারাই হলেন প্রথম ধারক-বাহক। তাঁরাই রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলেন। রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন। তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। সাহাবাগণ নামাজ পড়েছেন রাসূল ﷺ দেখেছেন। ভুল হলে শোধরিয়েছেন। রোজা রেখে তাঁর সাথে ইফতার করেছেন। তারাবীহ পড়েছেন। রাসূল ﷺ-এর সাথেই হজ করেছেন, উমরাহ করেছেন, জাকাত আদায় করেছেন তাঁর হাতে। জিহাদ করেছেন তার নেতৃত্বে। শহীদ হয়েছেন তাঁর সামনে। ব্যবহার শিখেছেন তাঁর কাছ থেকে। কথা শিখেছেন তাঁর মুখ থেকে। তাঁরই ছুহবত সংশ্রবে জীবন কাটিয়েছেন। অতএব তাঁরাই যদি সত্যের মাপকাঠি না হতে পারেন, তাঁদের জীবন যদি আমাদের জন্যে আদর্শ না হয়, তাঁদের যিন্দেগী যদি আমরা নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর উপর একটি অপবাদ আরোপ হবে। রাসূল ﷺ ছিলেন একজন অযোগ্য উস্তাদ [নাউযুবিল্লাহ]। কারণ কথায় বলে– বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়।

উস্তাদ কেমন তা প্রমাণিত হবে ছাত্রের ব্যবহারিক জীবন থেকে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সত্যের মাপকাঠি হতে না পারার দায়দায়িত্ব রাসূল ﷺ-এর উপর গিয়ে বর্তায় যার অনিবার্য ফল ইসলামের পুরো সৌধটাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া। কারণ তাদের থেকে ইসলাম নামের বৃক্ষটি সারা পৃথিবীতে চারা বিস্তার করেছে। বৃক্ষের গোড়াই যদি নড়বড়ে থাকে তাহলে তো শাখা-প্রশাখার কোনো মূল্য নেই।

এ বিষয়টি ইসলামের শত্রুরা বুঝেছিল মর্মে মর্মে। তাইতো অতি কৌশলে সাহাবীদের জীবনে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালায়।

## সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সমালোচনার উর্ধ্বে

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আল্লাহর মনোনীত, আল্লাহর পছন্দনীয়, আল্লাহর সন্তুষ্টিভাজন। রাসূলে কারীম ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন। আল-কুরআনের প্রথম মুখাতাব সম্বোধিত সত্তা। উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত। এজন্য তাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ নিয়েছেন। মানুষ হিসেবে কদাচিৎ যদি কোনো কিছু ঘটে যায়, কোনো অসঙ্গত কিছু প্রকাশ পায় তাঁদের থেকে, তাহলে এ ব্যাপারে শরিয়তের কি বিধান তাও আল্লাহর রাসূল ﷺ বলে দিয়েছেন।

হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- "আমার পরে যদি আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে কারো পদস্খলন ঘটে যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পূর্বের নেক আমলের বদৌলতে ক্ষমা করে দিবেন।

অন্যত্র বর্ণিত আছে যে-

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীদের মন্দ বল না, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর তাহলে তাদের একসের বা অর্ধসের যব দান সমপরিমাণ ছওয়াব হাসিল হবে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সাহাবাগণ (রা.) তাঁদের ঈমান-আমল দ্বারা আল্লাহর এত নিকট পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের সমালোচনা করা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ধৈর্যের বাইরে ছিল। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهَ اللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذٰى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَا اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّأْخُذَهٗ - (تِرْمِذِىْ)

আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, খবরদার! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাও। আমার পর তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুরূপে পরিগণিত করো না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে, সে যেন আমাকেই ভালোবাসল। আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখল সে যেন আমার সাথেই শত্রুতা রাখল। আর যে তাদেরকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল আল্লাহ তাকে অচিরেই গ্রেফতার করবেন।

## সমালোচনাকারীরা অভিশপ্ত

যারা সাহাবীদের সমালোচনা করে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ - (مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ - ص)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না। আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন আমার সাহাবীদের সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে। -[মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১]



## সমালোচনাকারীরা শাস্তিযোগ্য

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَبَّنِىْ فَاقْتُلُوْهُ وَمَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ فَاجْلِدُوْهُ - (اِبْنُ مَاجَهْ)

অর্থাৎ, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার সমালোচনা করে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর যে আমার সাহাবীদের সমালোচনা করে তাদেরকে বেত্রাঘাত কর। -[ইবনে মাজাহ]

## সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে মাযহাব চতুষ্টয়ের ফতোয়া

### হানাফী মাযহাব :

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা আব্দুল আজীজ পুরহারবী নিজ কিতাব নিবরাসের ৫৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- অধিকাংশ হানাফী ফুকাহাদের অভিমত ১ম ও ২য় খলীফা হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) -এর সমালোচনাকারী হত্যার উপযুক্ত। তার তওবা অগ্রহণীয় হবে। কারো মতে, তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। অন্যান্য সাহাবীদের সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে বিচারক তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

### মালেকী মাযহাব :

হযরত কাজী আয়ায মালেকী (র.) তার কিতাব আশ শিফায় উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহাবীদের সমালোচনা করে অর্থাৎ কাফের বা গোনাহগার বলে- চাই সে সাহাবী আবূ বকর (রা.), ওমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), মু'আবিয়া (রা.), আমর (রা.) বা অন্য যে কেউ হোক, সমালোচনাকারীকে হত্যা করা হবে।

মাওয়াহেবে লুদনিয়্যাতে বর্ণিত আছে- ইমাম মালেক (র.) সাহাবীদের সমালোচনাকারী রাফেজীদের কাফের ফতোয়া দিয়েছেন।

### হাম্বলী মাযহাব :

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলী (র.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর সমালোচনা করা, তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা জায়েজ নেই। কোনো ব্যক্তি এরূপ করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। সমালোচনাকারীকে তওবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি তওবা না করে তাহলে এমন শায়েস্তা করতে হবে যেন সে পুনরায় এমনটি আর না বলে। অথবা আঘাতে আঘাতে মারা যায়।

**শাফেয়ী মাযহাব :**

আল্লামা ইবনে রাহবিয়া সাহাবাদের সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর ফতোয়া উল্লেখ করেন– সমালোচনাকারীদের আজীবন বন্দি করে রাখা হবে।

## সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর ফজিলত

**কুরআনের আলোকে :**

রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার আদেশে যখন হিজরত করেছিলেন তখন তা ছিল গোপনে। কাফেরদের অগোচরে। হিজরতের বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে কাফেরদের একটি বাহিনী তাঁদের পিছু নেয়। উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথী আবূ বকর (রা.)-কে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া। এমনি শঙ্কিত অবস্থায় আত্মগোপন করলেন একটি গুহায় রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)। গুহায় বসে হযরত আবূ বকর (রা.) শঙ্কা প্রকাশ করছিলেন রাসূল ﷺ -এর কাছে। উত্তরে রাসূল ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তিত হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতে বিধৃত হয়েছে–

اَلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাঁকে [রাসূল ﷺ -কে] সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন। যখন কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি আপন সাথীকে বললেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

–[সূরা তওবা, আয়াত : ৪০]

হিজরতের মতো এমন কঠিন ও মোবারক কাজে রাসূল ﷺ -এর একমাত্র সাথি হওয়াটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশাপাশি তাঁর নির্বাচিত সাথীকেও ভালো লেগেছে। পছন্দ হয়েছে তাঁর আচার-আচরণ। এ জন্য কুরআনে রাসূল ﷺ -এর ঐ সাথির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى

অর্থ– দোজখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে– যিনি, সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী এবং পরহেজগার। তিনি তার সম্পদ খরচ করে আল্লাহর পথে নিজের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির জন্য।



এ ব্যাপারে সকল মুফাসসিরে কুরআন একমত যে, উক্ত আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর শানে নাজিল হয়েছে। তিনি যখন তার সকল মাল-সম্পদ, ধন-ঐশ্বর্য, টাকা-পয়সা অকাতরে আল্লাহর রাহে দীনের জন্য, ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিতে লাগলেন এবং পরপর সাতটি গোলাম ক্রয় করে আজাদ করে দিলেন। যারা ছিলেন নিপীড়িত। নির্যাতিত। সীমাহীন যাতনায় ক্লিষ্ট। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে তার পুরস্কার ঘোষণা করেন।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে বড় মুত্তাকী, আল্লাহভীরু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার মুত্তাকী যিনি, তিনিই হলেন সবচেয়ে সম্মানী সবচেয় উঁচু মর্যাদার অধিকারী।

হযরত মা আয়েশা (রা.) -এর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র হয়। তার বিরুদ্ধে কুৎসা রাটানো হয়। অভিযোগ আনা হয় চারিত্রিক অভিযোগ। ঘটনাটির নেপথ্য নায়ক ছিল মুনাফিকরা। মুনাফিকদের ছল-চাতুরিতে পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। সাহাবাদের অনেকে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায় এতে। রাসূল ﷺ ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিছুদিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করেন। হযরত আয়েশা (রা.) -এর পবিত্রতা বর্ণনা করেন বেশ কিছু আয়াতে। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে। নিরসন হয়ে যায় ভুল বুঝাবুঝির। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত মিসতাহ (রা.)ও ঐ বিভ্রান্তির শিকার ছিলেন। তিনি দরিদ্র সাহাবী হিসেবে হযরত আবূ বকর (রা.) আগে-পড়ে সবসময় তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তাছাড়া হযরত মিসতাহ (রা.) সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর আত্মীয়ও ছিলেন।

ঘটনা সমাপ্তির পর হযরত আবূ বকর মনের দুঃখে হযরত মিসতাহকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এটা উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তিনি আয়াত নাজিল করে তাঁর প্রিয় বান্দা আবূ বকর (রা.) -এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন–

তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী-মর্যাদাশীল তারা যেন নিকট আত্মীয়দের দান-অনুদান বন্ধ না করে।

উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে মর্যাদাশীল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর শানে হাদীস–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ -

নবী (সা:) এর পর আবু বকর (রা:) ও ওমর (রা:) কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে



হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, উম্মতের মধ্যে উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দরদি হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। –[তিরমিযি]

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ اِمْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِىْ شَىْءٍ فَامَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ قَالَتْ فَاِنْ لَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تَقُوْلُ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْنِىْ فَاْتِىْ اَبَابَكْرٍ - (بُخَارِىْ)

হযরত যুবাইর বিন মুতইম (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল ﷺ -এর নিকট আসলেন। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে রাসূল ﷺ তাকে ফিরে যেতে বলেন। এরই মধ্যে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন– হে রাসূল! আপনার ইন্তেকালের পর আমি কার কাছে যাব। হুজুর ﷺ বললেন, আমার পরে তুমি আবূ বকর (রা.)-এর নিকট আসবে। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اَدْرِىْ مَا بَقَائِىْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ -

হযরত হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, জানি না আর কতদিন তোমাদের মাঝে আছি। সুতরাং, তোমরা আমার পরে আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর অনুসরণ করবে। –[তিরমিযী]

## আবূ বকর (রা.) -এর বাণী

১. তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে গেছে তার জন্য দুনিয়ার সম্পদ ও মোহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার সুযোগ নেই এবং মানুষের মধ্যে একটি প্রভাব পড়ে যায়।

২. হযরত আবূ বকর (রা.) যখন অন্তিম শয্যায় তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে ডাক্তার আনার অনুমতি চাইলেন। উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, ডাক্তারের কি প্রয়োজন? [আসল] ডাক্তার তো আমাকে দেখে নিয়েছে। উপস্থিত সকলে ডাক্তারের মতামত জানতে চাইলেন। উত্তর আসল– ডাক্তার বলেছে, আমি যা চাই তা করি।

৩. হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, যখন আমি কোনো মদ্যপায়ী বা চোরকে গ্রেফতার করি, তখন আমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে আল্লাহ যেন এদের ইজ্জত রক্ষা করেন।

৪. আমি যখন কোনো অপরাধী তথা মদ্যপায়ী বা চোরকে গ্রেফতার করি, তখন আমার মন কেঁদে কেঁদে বলে– আল্লাহ যেন তার এ অপরাধের কথা সমাজে প্রকাশ না করেন।

আবু বকর (রা:) এর বাণী



৫. আল্লাহর শপথ, আমি কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ছিলাম না। আল্লাহ তা'আলার কাছে কখনো গোপন ইঙ্গিতে-এর জন্য দোয়াও করনি।

৬. কখনো উটে আরোহণ করতেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)। চলতে গিয়ে কাদাচিৎ লাঠি পড়ে গেলে নিজে নেমে লাঠি উঠাতেন। একদা এমনটি ঘটলে উপস্থিত লোকজন আরজ করলেন, আমীরুল মুমেনীন আমাদের বললেই হতো। আমরা উঠিয়ে দিতাম। উত্তরে তিনি বলেন– রাসূল ﷺ আমাকে কারো নিকট কোনো কিছু ছওয়াল করতে নিষেধ করেছেন।

## উম্মতের প্রতি নির্দেশ

১. হে লোকসকল! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর প্রশংসা করুন তাঁর মর্যাদানুসারে।

২. শঙ্কা ও আশা উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান কর।

৩. নাছোড়বান্দা হয়ে দোয়া কর।

৪. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বিনিময়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৫. আল্লাহ তা'আলার কিতাব তোমাদের মাঝে উপস্থিত। যার মর্যাদার আলো কোনোদিন শেষ হওয়ার নয়। অতএব, এ কিতাবের প্রতি আস্থা পোষণ কর। এ কিতাব হতে– অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাওয়ার উপদেশ গ্রহণ কর।

৬. আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা প্রতিটি মুহূর্তে কিয়ামতের নিকটবর্তী হচ্ছ। [অতএব, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রর্থনা কর।]

৭. দ্রুতগতিতে নেককাজ কর, কেননা তোমাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

৮. কতিপয় লোক নিজেকে ভুলে অপরের জন্য জীবন নাশ করে দেয়। আমি তোমাদেরকে এমনটি না করার পরামর্শ দিচ্ছি।

৯. খবরদার! কোনো মুসলমান ব্যক্তিকে খাটো চোখে দেখবে না। কেননা একেবারে নীচু পর্যায়ের মুসলমানও আল্লাহর দরবারে অতিশয় মর্যাদাশীল।

১০. আমি বুযুর্গী পেয়েছি তাকওয়ায়, ধন-ঐশ্বর্যেও বিশ্বাসে এবং সম্মান পেয়েছি বিনয়ে।

১১. সত্য কথা ও সৎক্রিয়া নিয়ে যায় জান্নাতে, মিথ্যা কথা ও অসৎকাজ নিয়ে যায় জাহান্নামে।

১৩. হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। শত্রুতা করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী ভাই ভাই হয়ে থাক।

১৪. রাসূল ﷺ -এর বরাত দিয়ে বলেন, গোলাম-বান্দীদের সাথে নিজেদের সন্তান এবং আপনজনের মতো আচরণ করবে। তাদেরকে পান করাও যা তোমরা পান কর, তাদেরকে ভক্ষণ করাও যা তোমরা ভক্ষণ কর। তাই পরিধান করাও যা তোমরা পরিধান কর।

১৫. প্রায়ই এ দোয়া করতেন– হে আল্লাহ! আমাকে সত্য পথ দেখিয়ে দিন এবং সত্য পথ অনুসরণে তাওফীক দান করুন। আমাকে বাতুলতার সন্ধান দিয়ে সেই ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দান করুন।

১৬. আমার নিকট হক-বাতিলের সংমিশ্রণ করো না। নতুবা আমি তো প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাব।

১৭. ইসলামের সেবা ও আল্লাহর আদেশ পালন আগামী দিনের জন্য রেখে দিওনা।

১৮. দুর্বল সেই ব্যক্তি, যার কোনো বন্ধু নেই।

## হযরত উমর (রা.) -এর ফজিলত

### কুরআনের আলোকে

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য মাখলুকাত। এ মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন মানুষকে। এ মানবজাতিকে সত্যপথে পরিচালিত করার জন্য পাঠিয়েছেন রাসূল ﷺ -কে। পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও দীনে হক্বসহ। এতো আয়োজন এতো প্রস্তুতি কেন? কিসের জন্য! আল্লাহ তাঁর দীন ইসলামের বিজয় ও প্রভাব দেখতে চান। আল্লাহ তা'আলার এ লক্ষ্যটি পূর্ণ হয়েছে হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতকালে। কারণ "এ লক্ষ্যটি সাধিত হয়েছে" ঐ সময়ই বলা যাবে, যখন পৃথিবীতে একমাত্র পরাশক্তি থাকবে ইসলাম। এ কথা সকলের জানা যে, ইসলামের শুরু লগ্নে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যই ছিল পৃথিবীর পরাশক্তি। সুতরাং পৃথিবীব্যাপী ইসলামের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অপরিহার্য ছিল রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস। শিরিক ও কুফরের পতাকা নামিয়ে সেখানে ইসলামি পতাকা উড্ডীন করা। আর এ কাজটি সাধিত হয়েছে হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতকালে। হযরত ওমরের (রা.) খেলাফতকালেই রোম ও পারস্য সম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয় এবং সেখানে ইসলামি কেতন পত পত করে উড়তে থাকে। আর তখনই সারা পৃথিবীতে ইসলাম একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে আভির্ভূত হয়।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার এ ইচ্ছাটি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে, ইরশাদ হচ্ছে– هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ



অর্থাৎ, তিনি এমন সত্তা যিনি তার রাসূল ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দীনসহ, এজন্য যে তিনি তার দীনকে অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করবেন।

### হাদীসের আলোকে

শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সুযোগ বুঝে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-কে শয়তান ধোঁকা দেওয়াতো দূরের কথা, তাঁর কাছেই ভিড়তে পারত না। কারণ শয়তান হযরত ওমর (রা.)-কে ভীষণ ভয় করত।

বর্ণিত আছে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَالَقِيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ (بُخَارِىْ)

অর্থাৎ, হযরত সা'আদ বিন ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, হে খাত্তাব পুত্র ওমর! শয়তান যখন তোমাকে কোনো রাস্তায় চলতে দেখে তখন শয়তান ঐ রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ

অর্থাৎ, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন– হে ওমর! নিশ্চয় শয়তান তোমাকে ভয় পায়।

অন্যত্র এরশাদ করেন–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ ـ (تِرْمِذِىْ)

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ ফরমান– আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর (রা.) -এর যবান ও দিলের উপর সত্য কায়েম করে দিয়েছেন। –[তিরমিযি]

অন্যত্র বর্ণিত আছে–

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

অর্থাৎ, উকবা বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– যদি আমার পর নবী হওয়ার অবকাশ থাকত তাহলে ওমর নবী হতো। –[তিরমিযি]

## হযরত ওমর (রা.) -এর ইচ্ছার সমর্থনে নাজিলকৃত আয়াত

প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু পর্দার প্রথা ছিল না, তাই মহিলাগণ অবাধে পুরুষদের নিকট আসত। পুরুষরাও মহিলাদের নিকট যেত। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর এটা পছন্দ লাগতো না। বিষয়টি অসঙ্গত মনে হতো। বিষয়টি তিনি প্রকাশ করেছিলেন "এভাবে যদি পর্দার বিধান আসতো!" আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে পর্দার আয়াত নাজিল করেন। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

অর্থাৎ, আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। তা তাদের জন্য পবিত্রতম উপায়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে খবর রাখেন।

হযরত ওমর (রা.) মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জন্য বিশেষ স্থান হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বারবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে আসছিলেন। এরই মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা এল– وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অর্থাৎ, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান বানাও।

হজ যাত্রীদের জন্য মাকামে ইব্রাহীমে দু' রাকা'আত নামাজ পড়া সুন্নত। রাসূল ﷺ সেখানে নামাজ আদায় করেছিলেন।

বদর যুদ্ধ শেষে বেশ কিছু কাফের বন্দী হয়। পরামর্শ করা হলো। এদের কি করা যায়। পথ খোলা আছে কয়েকটি। ফিদিয়া মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। বন্দী করে রাখা। হত্যা করা। অধিকাংশ সাহাবাগণ মত দিলেন, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে। যুক্তি ছিল মুহাজিরগণ মদিনায় এসেছে সকল মাল-সম্পদ রেখে। এমতাবস্থায় অর্থসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) -এর মত ছিল বিপরীত মেরুতে। সকল কাফের বন্দীদের হত্যা করার ব্যাপারে তিনি মত প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, কাফেরদের মধ্যে মুসলমানদের যে সকল আত্মীয় আছে ঐ আত্মীয় আত্মীয়দের হত্যা করবে। এ কথা তিনি বলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত দিলেন ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার দিকে। ফয়সালা কার্যকরী হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তারা যেন হত্যার দিকে অগ্রসর হয়। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ইচ্ছার কথা এভাবে প্রকাশ করেন–



مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থাৎ, কোনো নবীর জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি বন্দীদের রক্ত প্রবাহিত না করে ছেড়ে দিবেন। তোমরা দুনিয়ার আসবাব তালাশ করছো? অথচ আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী-প্রজ্ঞাময়। যদি বিষয়টি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত না হতো তাহলে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্মের দরুন মহাশাস্তি তোমাদের পাকড়াও করত।

এমনিভাবে শরাব হারাম হওয়ার প্রশ্নে হযরত ওমর (রা.) -এর পীড়াপীড়ি চলছিল আগে থেকেই। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের মাধ্যমে মদ হারাম ঘোষণা করেন।

এমনিভাবে শুরু থেকে হযরত ওমর (রা.) নামাজের পূর্বে নামাজের দিকে মানুষকে আহ্বানের একটি ব্যবস্থার আরজি পেশ করে আসছিলেন। অবশেষে ওয়াহীর মাধ্যমে আজান দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

## হযরত ওমর (রা.) -এর পবিত্র বাণী

১. আমার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজ ঠিক করে নিল সে তার দীনকে সংরক্ষণ করে নিল এবং যে ব্যক্তির নামাজে ত্রুটি থেকে গেল তার অন্যান্য কাজে ত্রুটি হবে নিশ্চিত।

২. দরুদ ব্যতীত দোয়া আকাশে লটকে থাকে।

৩. সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হলো ফরজ আদায় করা, নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা এবং অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবমানী করা।

৪. ধৈর্য দু'প্রকার। একটি হলো বিপদে ধৈর্যধারণ করা। ২য় হলো গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখার ধৈর্যধারণ। ২য়টি উত্তম এবং এটা ঈমানের ফাউণ্ডেশন।

৫. আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর করুণা করেন না যে, অন্যের প্রতি করুণা না করে এবং তিনি ঐ ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করেন না, যে অপরের অপরাধ ক্ষমা না করে।

৬. কুরআনে কারীমের প্রতি উদাসীন হয়ো না, কুরআন আকড়ে ধরে রাখ, গোমরাহ হবে না।

৭. দু'টি বিষয়ের উপর যত্নবান হওয়া জরুরি। এক. ফয়সালায় ইনসাফ রক্ষা করা। **দুই.** বণ্টনে ইনসাফ রক্ষা করা। যতদিন এই দু'টি কাজ ঠিকমতো আঞ্জাম পাবে ততদিন সমাজে কল্যাণ বইতে থাকবে।

৮. প্রত্যেকে নিজ সন্তানদের সাঁতার কাটা, তীর চালান এবং ঘোড়া দৌড় শিখাবে। কারো অসম্মানী করবে না।

৯. যে ব্যক্তি তার অবস্থান সন্দেহের উর্ধ্বে না রাখে সে যেন তার প্রতি ভিন্ন মত পোষণকারীর তিরস্কার না করে।

১০. যে ব্যক্তি তার রহস্য লুকিয়ে রাখে তার কাজ স্বীয় ইচ্ছাধীনে থাকে।

১১. ৩টি বিষয় মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার সৃষ্টি করে- **এক.** আগে আগে সালাম দিলে, **দুই.** ব্যক্তির পছন্দসই নামে/ উপাধিতে ডাক দিলে, **তিন.** সভা-মজলিসে তার জন্য রাস্তা প্রশস্ত করলে।

১২. সবচেয়ে দানবীর ঐ ব্যক্তি যে, এমন ব্যক্তিকে দান করে তাকে যে দেয়নি।

১৩. সবচেয়ে সহনশীল ঐ ব্যক্তি যে, জালেমের জুলুম মাফ করে দেয়।

১৪. লোভ দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, অল্প তুষ্টি ধনী করে দেয়।

১৫. যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বিনয় প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হেকমত [জ্ঞানের গভীরতা] বৃদ্ধি করে দেন। সে আপন দৃষ্টিতে ছোট হলেও সমাজে সম্মানী হয়ে উঠে।

১৬. অতিমাত্রায় ব্যভিচার হলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়, রাজা-বাদশাহদের জুলুমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়।

১৭. যে ব্যক্তি জীবনে সফলতা চায় সে যেন তার পিতার ইন্তেকালের পর পিতার বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে সদাচরণ করে।

১৮. এমন কাজ কর, যদি তোমাকে সে কাজে কেউ দেখে তাহলে তা যেন তোমার জন্য অসঙ্গত না লাগে।

১৯. ওলামাদের মাহফিল-মজলিস বৈঠক থেকে দূরে থেকো না। এ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা ওলামাদের বৈঠকের তুলনায় কোনো সম্মানী স্থান সৃষ্টি করেননি।

২০। ইলম শিখ এবং এ ইলমের জন্য ভাব-গাম্ভীর্যতা, হিম্মত ও বাকশক্তি অর্জন কর।

২১. যখন কোনো আলেমকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত দেখ, তখন তার দীনি কথাবার্তার প্রতি গুরুত্ব দিবে না।

২২. একজন আলেমের ইন্তেকাল হাজার দিবা-নিশি ইবাদত কারীর [দিবসে রোজা-রাতে নামাজ আদায়কারী] ইন্তেকালের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর।

২৩. তওবাকারীদের কাছে বসিও, কারণ তাদের হৃদয় খুবই নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে।



২৪. সবচেয়ে অজ্ঞ ঐ ব্যক্তি, যে অপরের পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য নিজের আখেরাত মিটিয়ে দেয়।

২৫. দুনিয়া ও আখেরাত মুখোমুখি হলে আখেরাতকে প্রাধান্য দাও, কেননা দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী।

২৬. কুরআনে কারীমের ইলম অর্জন কর, কারণ এর মাঝে ইলমের ঝরনা এবং অন্তরে বাহার সৃষ্টি হয়।

২৭. আমরা ঋণ দেওয়া কৃপণতার আলামত হিসেবে জানি, অভাবীদের এমনিই দিয়ে দিই।

২৮. পার্থিব সম্পদ অল্প অর্জন কর, তাহলে স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারবে। গুনাহ কম কর মৃত্যু সহজ হবে।

২৯. অনেক সময় ছোট বাচ্চাদের হাত ধরে বলতেন আমার জন্য দোয়া কর, কেননা এখনো তোমরা গুনাহ করোনি।

৩০. প্রায়ই এই দোয়া করতেন [অন্তিমকালে]। হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তায় শহীদ করুন এবং আপনার রাসূল ﷺ -এর শহরে মৃত্যুদান করুন।

৩১. তওবার তিক্ততা সহ্য করার চেয়ে পাপ না করা অনেক ভাল।

৩২. কোনো কাজের দায়িত্ব নেওয়ার আগে বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নাও।

## হযরত উসমান (রা.) -এর ফজিলত

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন তৃতীয় খলীফা। রাসূল ﷺ -এর জামাতা। হযরত ওমর (রা.) -এর শানে যে আয়াতটি পেশ করা হয়েছিল ঐ আয়াতটি হযরত উসমান (রা.) -এর শানেও বিধৃত। কারণ রোম পারস্যের উপর বিজয়ের পূর্ণতা পেয়েছে হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফত কালে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعُثْمَانَ اَلَا اَسْتَحْيِ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ.

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ হযরত উসমান (রা.) সম্বন্ধে ইরশাদ করেন-আমি ঐ ব্যক্তি থেকে কেন লজ্জা করব না যাকে ফেরেশতাগণ লজ্জা করে। -[মুসলিম শরীফ]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِيْ يَعْنِيْ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ ফরমান-প্রত্যেক নবীর একদল সাথি আছে আর জান্নাতে আমার সাথি হলো উসমান। -[তিরমিযী]

## হযরত ওসমান (রা.) -এর বাণী

- দুনিয়ার চিন্তার দ্বারা অন্ধকার সৃষ্টি হয় আর পরকালের ফিকিরের দ্বারা আলোর উদ্ভব হয়।
- মুত্তাকীর আলামত হলো নিজেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করে অন্য সকল লোকের ব্যাপারে ধারণা থাকবে- তারা মুক্তিপ্রাপ্ত।
- সুদীর্ঘ হায়াত পেয়েও আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে না পারাই হলো সবচেয়ে ব্যর্থতা।
- দুনিয়া যার জন্য জেলখানা, কবর তার জন্য আরামদায়ক স্থান হবে।
- তোমাদের অন্তর পাক হয়ে গেলেও কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত বা শ্রবণ থেকে বিরত থেকো না।

## হযরত আলী (রা.) -এর ফজিলত

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ ـ (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তুমি আমার নিকট এমন যেমন ছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে হারুন (আ.)। তবে আমার পর আর কোনো নবী আসবে না।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِىُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

অর্থাৎ, ইমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইশাদ করেন- নিশ্চয় আলী আমার এবং আমি আলীর এবং সে সকল মুমিনের প্রিয় ভাজন। -[তিরমিযী]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা।

## হযরত আলী (রা.) -এর বাণী

- বান্দার উচিত স্বীয় প্রভু ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আশাবাদী না হওয়া এবং নিজের গুনাহ ব্যতীত কোনো বস্তুকে ভয় না করা।



- অজানা বিষয় শিক্ষার মাঝে কোনো লজ্জা নেই। জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে অকপটে বলে দেওয়া উচিত আল্লাহ ভালো জানেন।
- কবরবাসীরা আমার উত্তম সাথি। তারা কারো দোষ চর্চা করে না এবং আখেরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।
- মানুষ ঘুমন্ত। মরলে পরে জাগ্রত হবে।
- যে নিজেকে চিনতে পারল সে তার প্রভুকে চিনতে পারল।
- প্রত্যেক মানুষ তার রসনার নিচে লুক্কায়িত।
- যার ভাষা মিষ্টি তার বন্ধু বেশি।
- ব্যক্তির প্রতি না তাকিয়ে তার কথার প্রতি মনোযোগী হও।
- করুণা কথা বলার পথ বন্ধ করে দেয়।
- শত্রু আয়ত্তে এসে গেলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই হলো তার শুকরিয়া।
- যে ব্যক্তি কোনো কথা গোপন রাখে তার ভাষাও বাহ্যিক আকৃতিতে তা ভেসে উঠে।
- ইলম ছোটকে বড় করে দেয় এবং মুর্খতা বড়কে ছোট করে দেয়।
- জ্ঞান সম্পদ থেকে উত্তম। কেননা জ্ঞান তোমাকে হেফাজত করবে এবং সম্পদের হেফাজত তোমাকে করতে হবে।
- ঈমানের আলামত হলো- যেথায় সত্য বললে ক্ষতির আশঙ্কা সেথায়ও সত্য বলা।
- করুণা করে স্বাধীন ব্যক্তিকেও গোলাম বানানো সম্ভব।
- তকদীরের মোকাবিলায় কৌশল নিষ্ফল।
- কৃপণ দ্রুত ফকির বনে যায়। জাগতিক জীবনে দারিদ্র্যসুলভ জীবনযাপন করে। পরকালে সম্পদশালীদের মতো হিসাব দিতে হবে।
- আহমক সদা মুখোপেক্ষী থাকে। জ্ঞানী সদা অমুখাপেক্ষী থাকে এবং লোভী অপমানজনক জীবনযাপন করে।
- লোভ যখন অন্তরে ঢুকে যায় তখন আকল বেকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- যার বুদ্ধি নেই তার থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করো না।
- সাধক হওয়ার আগে বিদ্যা অর্জন কর।
- অল্প দ্রব্য দান করতে লজ্জিত হয়ো না, কেননা বিমুখ অপেক্ষা অল্প দান ভালো।
- যার লিপ্সা যত বেশি, আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস তত কম।
- অসৎ লোক কাউকে সৎ মনে করে না, সবাইকে তার মতো ভাবে।
- যে নিজে সতর্কতা অবলম্বন না, দেহরক্ষী তাকে বাঁচাতে পারে না।
- যে ব্যক্তি তার ভিতরের অংশ সুন্দর করবে আল্লাহ তার বাইরের অংশ সুন্দর করবেন।

✱ যে নিজের মর্যাদা নিজে বুঝে না, অন্যেও তার মর্যাদা দেয় না।

✱ বেশি আশা দীর্ঘ শোকের কারণ।

## হযরত মুআবিয়া (রা.) -এর ফজিলত

রাসূলে করীম ﷺ -এর একজন বিশিষ্ট সহচর হযরত মু'আবিয়া (রা.)। তিনি ওহী লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রাসূল ﷺ -এর নিকট থেকে ১৬৩টি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন একজন যোগ্যতম বিচক্ষণ ব্যক্তি। হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফতকালে বিভিন্ন প্রদেশে সাবায়ী চক্র ফেৎনার জাল বিস্তার করেছিল। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর শাসিত এলাকা সিরিয়া ছিল সম্পূর্ণ শান্ত কোলাহল মুক্ত। বিশৃঙ্খলাকারীরা ষড়যন্ত্রের কোনো অবকাশ পায়নি। হযরত মু'আবিয়া (রা.) রাসূল ﷺ -এর খুবই প্রিয় ছিলেন। ছিলেন মহব্বতের ও পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব। তাইতো তিনি সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্য থেকে হাতেগোনা কয়েকজন ওহীর লিখক হিসেবে বেছে নেন এবং তাদের মধ্যে হযরত মু'আবিয়া (রা.) ছিলেন অন্যতম। হযরত মু'আবিয়ার (রা.) প্রতি রাসূল ﷺ -এর স্নেহ মহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ হযরত মু'আবিয়াকে রাসূল ﷺ তার নিজের একটি জামা হাদিয় দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে ভালোবেসেই তার জন্য দোয়া করেছিলেন।

আব্দুর রহমান বিন আবী উমাইয়া রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর প্রতি লক্ষ্য করে বলেন– 'হে আল্লাহ আপনি তাকে হেদায়েতপ্রাপ্তও পথপ্রদর্শক বানান। –[তিরমিযী]

## ইয়াযীদ যেভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেল

জীবন সন্ধ্যায় উপনীত হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.)। জীবন প্রদীপ নিভু নিভু করছে। নববী উদ্যানের আরেকটি ফুল ঝরে পড়ার সময় ঘনীভূত। ইলমে ওহীর নক্ষত্ররাজি থেকে ছিটকে পড়বে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু জাতির কি হবে? কি দশা হবে এ সমাজের? এই দরদমাখা আবেগ নিয়ে হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) উপস্থিত হন দামেস্কে। সাক্ষাৎ করলেন ইয়াযীদের সাথে। বললেন–

বড় বড় সম্মানিত সাহাবাগণ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। বর্তমানে তাদের সন্তানরা জীবিত। যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি দিক থেকে আমি তোমাকে খেলাফতের উপযুক্ত মনে করি। তোমার পিতা হযরত মু'আবিয়া (রা.) হয়তো আর বেশি দিন



দুনিয়ায় থাকবে না। তাই রাষ্ট্রীয় এ দায়িত্ব তুমিই নিয়ে নাও। যাতে করে উম্মতের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয়। ইয়াযীদ বিষয়টি পিতা মহোদয়ের গোচরীভূত করেন। পিতা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। হযরত মুগীরা (রা.) উপস্থিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আপনি কোনো দ্বিধা সংকোচে থাকবেন না। আপনি জানেন হযরত উসমান (রা.)-এর পর খেলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের কত রক্ত ঝরেছে। অতএব, কোনো চিন্তা ফিকির না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিন। ইতোমধ্যে কুফার এক সম্মানিত কাফেলা উপস্থিত হন হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর নিকট। তারাও ইয়াযীদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে মত প্রকাশ করে যান এবং ইয়াযীদের ব্যাপারে যোগ্যতার স্বীকৃতিমূলক বক্তব্য রাখেন। বিষয়টি আমি বিবেচনা করে দেখব। এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি করা মোটেই উচিত নয়। তোমরা এনিয়ে অগ্রসর হবে না। আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তা হবে। এভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন হযরত মু'আবিয়া (রা.)। একে একে দুই দফা প্রস্তাব আসার পর হযরত মু'আবিয়া (রা.) বিষয়টি আমল দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন। তাই মদিনার গভর্নর মারওয়ানের নিকট পত্র লিখে পাঠান এ ব্যাপারে মতামত যাচাই করার জন্য। মারওয়ান মদিনাবাসীকে একত্র করে ঘোষণা করেন, হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) চান জীবদ্দশায় তার পরবর্তী আমীর নিযুক্ত করে যাবেন। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানতে চেয়েছেন। সকলে সমস্বরে উত্তর দিলেন হ্যাঁ, ভালো-ই হবে। তিনি যে ইচ্ছা করেছেন তা উম্মতের জন্য খুবই মঙ্গল হবে। মারওয়ান এ সংবাদ হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর নিকট জানিয়ে দিলে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) এতটুকু যথেষ্ট মনে না করে চার বিশিষ্ট সাহাবী **এক.** হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.), **দুই.** আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর (রা.), **তিন.** আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.), **চার.** ইমাম হুসাইন (রা.) -এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন এ ব্যাপারে মশওয়ারা করার জন্য। তাদের পক্ষ থেকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর বলেন, খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে পিছনে রেখে যাওয়া যে তিন উসূল আছে, ঐগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটি অনুসরণ করুন। উল্লেখ্য, উসূল তিনটি নিম্নরূপ–

১. রাসূল ﷺ কর্তৃ কাউকে আমীর না বানিয়ে উম্মতের উপর ছেড়ে যাওয়া।

২. হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক হযরত ওমর (রা.)-কে খলীফা নিযুক্ত করে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট কাউকে খলীফা বানিয়ে যাওয়া।

৩. হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক ছয়জনের শূরা কমিটি প্রস্তাব করে যাওয়া।

অবশ্য ব্যক্তি ইয়াযীদের প্রতি তাদের দ্বিমত ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা.) যেহেতু খলীফায়ে বরহক ছিলেন। সে মতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার ছিল তার। তাই তিনি সকলের মতামত শেষে ইয়াযীদকে শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিলেন।

## হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) -এর ইন্তেকাল ও অসিয়ত

হযরত মু'আবিয়া (রা.) মৃতশয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্বে দেশ ও জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ পেশ করেন।

**ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** আমি ছিলাম একটি ফসল যা কাটার সময় ঘনীভূত। আমি এ যাবৎ তোমাদের উপর হুকুমত পরিচালনা করেছি। আমি তোমাদের থেকে উপকার আদায় করেছি। কিন্তু মনে রেখ আমার প্রতিনিধি যে হচ্ছে সে আমার থেকে ভালো হবে না। যেমন আমি আমার পূর্বেকার খলীফাদের থেকে উত্তম ছিলাম না। কথিত আছে যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। "হে আল্লাহ আমি আপনার সাক্ষাৎ কামনা করি, ভালোবাসি। আপনিও আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করে নিন এবং সাক্ষাতে বরকত দান করুন।" এই দোয়া পাঠ করে ভাষণের সমাপ্তি টানেন। এই ভাষণের কিছুক্ষণ পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াযীদ ঐ ভাষণের সময় উপস্থিত ছিল না। তাই তার প্রতি অসিয়তনামা রেখে যান।

**অসিয়তের সার সংক্ষেপ**

শোন, তোমার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করবে। মদিনাবাসীর উপর করুণা ও অনুকম্পা করবে। যদি মদিনার কেউ কোনো জরুরত নিয়ে আসে তার যত্ন নিবে এবং প্রয়োজন পূরণে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। ইরাকীদের উপরও সযত্ন দৃষ্টি রাখবে। যদি তারা গভর্নর পরিবর্তনের কথা বলে তা করে দিও। এমনিভাবে সিরিয়াবাসীর প্রতি সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করবে। তাদের থেকে রাষ্ট্রে বিভিন্ন কাজে আন্তরিকতা ও সহযোগিতা পাবে। আর শোন! চার বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) জীবিত আছেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। এদের মধ্যে অন্যতম হযরত হুসাইন (রা.)। তিনি অত্যন্ত সরল নিষ্কলুষ ব্যক্তি। তার ভিতরে কোনো কালিমা নেই। যদি কখনো তিনি তোমার মোকাবিলায় আসেন আর তুমি প্রবল থাক। তাহলে তার সাথে উত্তম ও সদ্ব্যবহার করবে। তিনি অত্যন্ত কাছের ও শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার অপরিসীম হক আছে আমাদের উপর। বিশেষ করে তিনি রাসূল ﷺ -এর কলিজার টুকরা। ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে



বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে একটি জামা দান করেছেন। আমি তা সংরক্ষণ করেছি। এবং একদিন হুজুর ﷺ নখ কাটতেছিলেন। আমি এটা কুড়িয়ে একটি শিশিতে ভরে হেফাজত করেছি। আমার কাফন পরানোর পর হুজুর ﷺ -এর হাদিয়াকৃত জামাটি আমাকে পরিয়ে দিবে এবং নখগুলো আমার চোখ মুখে মুছে দিবে। হয়তো আল্লাহ তা'আলা এগুলোর বরকতে আমাকে মাফ করে দেবেন। -ইবনে আছীর-৪র্থ খণ্ড)

## কেমন ছিলেন তিনি

হযরত মু'আবিয়া (রা.) বংশগত দিক থেকে ছিলেন অভিজাত বংশীয়। বনূ হাশেমের পরেই যার স্থান। ব্যক্তি জীবনেও ছিলেন তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, রাসূলে কারীম ﷺ -এর সান্নিধ্য তার জীবনকে করেছে ধন্য ও গর্বিত। ওহী লেখার মতো এত গুরুত্ব পূর্ণ কাজ ও আঞ্জাম দিয়েছেন হুজুর ﷺ -এর ইশারায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও চৌকস আমীর। তাকে ধোঁকা দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। যে কেউ ছলচাতুরী করতে গেলেই তার দূরদর্শিতার কাছে ধরা পরে যেত। কিসরা কায়সার রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় পারদর্শী ছিল, লোকমুখে তাদের দক্ষতার কথা স্বীকৃতি ছিল সর্বজন বিদিত। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) একদা বলেন, তোমরা কিসরা কায়সারের প্রশংসা কর, অথচ তোমাদের মাঝে আমীরে মু'আবিয়া (রা.) আছেন। হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতকালে তার যোগ্যতার এত প্রচার ও প্রসার ঘটেনি এরপরও এমন মন্তব্য করেছেন তার শানে। পরবর্তী ঘটনারাজি আরও ব্যাপক দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে।

## রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ

হুকুমত পাওয়ার পর রাষ্ট্রে স্থিতিশীল আনতে কিছুটা কঠোরতা করতে হয়েছে তাঁর। কারণ ঐ সময় কঠোরতা ছিল সময়ের দাবি। অবশ্য তিনি যথাসম্ভব নরম আচরণের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন, বনূ হাশেমের লোক এসে তার সাথে রূঢ় আচরণ করতেন। কঠোর ভাষায় কথা বলতেন। এসব তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। উপরন্তু তাদেরকে দিতেন উপঢৌকন, উপহার।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) -এর সাথে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় কথা বলেন এবং তার সাথে মন্দ আচরণ করেন? উপস্থিত লোকজন উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমীরুল মুমেনীন আপনি কি এর সাথেও নরম আচরণ করবেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) জবাব দিলেন, আমি

নরম আচরণ করব, ভালো ব্যবহার করব। তবে যদি ব্যাপার এমন হয় যে, রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির উপর প্রভাব পড়ে তাহলে তা আর ক্ষমা করা যায় না।

-[ইবনে আছীর : ৪র্থ খণ্ড]

হযরত মু'আবিয়া (রা.) তার রাজনৈতিক নীতিমালা স্বয়ং নিজে বর্ণনা করেন- যেখানে বেত্রাঘাত করলে পড়ে কাজ সেরে যায় সেথায় আমি তরবারি উঠাই না এবং যেখানে কথার দ্বারা কাজ সেরে যায় সেথায় আমি চাবুক বা বেত ব্যবহার করি না। আমার সাথে কোনো মানুষের সাথে চুল পরিমাণও যদি সম্পর্ক হয় আমি তা অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। কিছুতেই তা ছিন্ন হতে দেই না। সম্পর্ক জুড়ে রাখি। লোক সকল দূরে সরে যেতে চাইলে আমি কাছে গিয়ে মিলবার চেষ্টা করি।

-[ইবনে আছীর : ২য় খণ্ড]

## ব্যক্তি জীবন

হযরত মু'আবিয়া (রা.) ১৮ বছর থেকেই রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তা ইন্তেকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিরিয়ার মতো একটি উন্নত এলাকার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এ জন্য বেশভূষা, চালচলন ইত্যাদিতে উন্নত উন্নত ভাব ছিল। তার মানে এই নয় যে, তিনি গরিব-দুঃখীর প্রতি উদাসীন ছিলেন। বরং এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি সদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। ঐতিহাসিক মাসউদী তার ২৪ ঘন্টার কর্মতৎপরতার বিবরণ পেশ করেন এভাবে।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) ফজর নামাজ শেষে বিভিন্ন দেশের খবরাখবর শুনতেন, অতঃপর কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াত শেষে দরবারে গিয়ে জরুরি আহকাম বিধিবিধান অনুমোদন দিতেন। পরে চার রাকাত ইশরাক আদায় করে নীতিনির্ধারকদের বৈঠকে বসতেন। সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদে যেতেন। মসজিদে অপেক্ষমাণ বিভিন্ন পেশাজীবী-শ্রমিক, কৃষক ও দুঃখী মানুষের অভিযোগ জরুরত ইত্যাদি কথা ধৈর্যসহকারে শুনতেন এবং তাদের সমস্যা সামাধানের ব্যবস্থা নিতেন। এ মজলিস শেষ করার পর বিভিন্ন গোত্রের ও বংশের সম্মানিত সর্দার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সমাবেশে যেতেন। এবং তাদের সাথে আলোচনা করতেন। এবং দিকনির্দেশনা দিতেন কিভাবে তারা সমাজের নেতৃত্ব দিবে, সমাজ পরিচালনা করবে। এসব মজলিস শেষে খানা খেতেন। নাস্তা খাওয়ার সময় তার সহযোগী প্রত্যন্ত এলাকা হতে আগত বিভিন্ন লোকের লিখিত বিভিন্ন বিষয় পেশ করতেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) তার জবাব দিতেন সহযোগী তা লিখতেন। খানার সাথে সাথে এ কাজ শেষ করে নিতেন।



মাগরিবের আগে রাতের খাবার— খাইতেন মুয়াবিয়া (রা.)

এরপর দরবারে যেতেন এবং জোহর নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে গমন করতেন। জোহর নামাজ শেষে ইলমী গবেষণা মজলিসে বসতেন। এ বৈঠকে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ শরয়ী দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। এ বৈঠক আসর নামাজ পর্যন্ত স্থায়ী হতো। আসর নামাজ শেষে অন্দর মহলে যেতেন এবং মাগবিরের কিছু সময় পূর্বে বাইরে খাওয়ার বৈঠকে বসতেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ পজিশন অনুসারে আপন আপন আসনে বসে যেতেন এবং সকলের সাথে রাতের খাবার আহার করতেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে মাগরিব নামাজ আদায় করতেন। মাগরিব নামাজ শেষে আওয়াবীন আদায় করে অন্দর মহলে যেতেন। এশার নামাজের কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদে যেতেন। এশার নামাজ শেষে বিশেষ বিশেষ লোকদের বৈঠক বসত। এ বৈঠকে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নর, মন্ত্রীবর্গ এবং নীতিনির্ধারকগণ শরিক হতেন। বৈঠকে প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের অবশিষ্ট কাজ সম্পর্কে আলোচনা হতো এবং সিদ্ধান্ত হতো। এ আলোচনা শেষে ইতিহাস এবং অতীতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজ্য পরিচালনার উপর আলোচনা হতো। এ বৈঠক রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত স্থায়ী হতো। অতঃপর আরাম করতেন। রাতের দুই-তৃতীয়াংশ চলে যেতেই উঠে যেতেন। তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এবং মুতালায়া করতেন। মুতালায়ায় সাধারণত রাজ্য পরিচালনার ইতিহাস, রাজ্য শাসন পদ্ধতি, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেত। এ ধারাবাহিকতা তাহাজ্জুদ পর্যন্ত দীর্ঘ হতো। ফজরে আজান হলে দু'রাকাত সুন্নত আদায় করে মসজিদে গিয়ে জামাতে শরিক হতেন।

## ইয়াযীদের পরবর্তী আচরণের জন্য হযরত মু'আবিয়া (রা) দায়ী নন

কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) -এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে যে, তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ইসলামের সর্বজনবিদিত নীতি ভেঙ্গে ব্যক্তি শাসনের প্রবর্তন করেন। এটা এমন একটি কথা যা সর্বৈব মিথ্যা, বানোয়াট, অসার, ষড়যন্ত্রমূলক। যা কেবল ইসলাম ও নবী-সাহাবীর দুশমনরাই বলতে পারে। কোনো মুমিনের হৃদয়ে কখনো এমন জঘন্য মিথ্যাচার আসতে পারে না, কোনো পবিত্র রসনা এমনি পাপাচার কথা উচ্চারণ করতে পারে না। কোনো মুমিনের কলম এমনি অপবাদ লিখতে পারে না। বরং এসব যারা লেখে তারা মিথ্যুক, যে পুস্তকে লেখা হয় তা ইতিহাস নয়, কল্প-কাহিনী। ইতিহাস হিসেবে সেগুলো পড়া আদৌ ঠিক হবে না।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর সামনে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের ৩টি আদর্শ ছিল। **এক.** হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কর্তৃক, তিনি তার পরবর্তিতে কে খলীফা হবেন, কে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে– এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে বলে যাননি। বিষয়টি উম্মতের উপর ছেড়ে গেছেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তা ঠিক করে নিয়েছেন। **দুই.** হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক, তার জীবদ্দশায় হযরত ওমর (রা.) -এর নাম ঘোষণা করে যাওয়া। **তিন.** হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক, পরবর্তী খলীফা নিরূপণের জন্যে কয়েকজনকে প্রস্তাব করে যাওয়া। যেমন– তিনি ছয় জন বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) -এর নাম প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) এই ৩টি থেকে ২য় আদর্শ গ্রহণ করেছেন। হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা.) -এর মতো একজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি পরামর্শও করেছেন বিভিন্ন সাহাবী (রা.) ও বিভিন্ন গভর্নরদের সাথে।

প্রশ্ন থেকে যায় ইয়াযীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর দ্বিমত ছিল? এর উত্তরে বলা যায় হযরত ওমর (রা.)-এর কঠোরতার অভিযোগ এনেও কেউ কেউ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর নিকট আপত্তি তুলেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) তা নাকচ করে নিজের মত বহাল রেখেছেন।

এরপরও প্রশ্ন হতে পারে ইয়াযীদের মতো একজন দুশ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির উপর কি করে ক্ষমতা দেওয়া হলো। এর উত্তরে বলবে– ইয়াযীদের চারিত্রিক অপরাধ হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর জীবদ্দশায় প্রকাশ পায়নি। অধিকন্তু হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) -এর মতো ব্যক্তি ইয়াযীদের ঐ সময়কার চরিত্রের প্রশংসা করেছেন হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর নিকট। তদুপরি হযরত মু'আবিয়া (রা.) ইন্তেকালের পূর্বে ইয়াযীদের প্রতি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো যে অসিয়তনামা রেখে গেছেন। যদি ইয়াযীদ ঐ অসিয়ত মতো কাজ করে যেত তাহলে হয়তো ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। কিন্তু দুর্ভাগা হতভাগা ইয়াযীদ সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করেনি। পাপিষ্ট ইয়াযীদ পিতা মহোদয়ের অসিয়ত মূল্যায়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

সুধী পাঠক! চিন্তা করুন। এরপর নবী করীম ﷺ -এর মজলুম সাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর উপর কোনো অভিযোগ থাকে? থাকতে পারে না। নবীর একান্ত স্নেহভাজন, নবীপ্রেমে পাগলপারা, দায়িত্ববোধে কর্মব্যস্ত, কর্মতৎপর, যার ২৪ ঘন্টাই ব্যয় হতো দীনের জন্য, উম্মতের জন্য, উম্মতের কল্যাণের জন্য; তার উপর এমনি একটি কালিমা লেপন করা কত বড় অপরাধ, তা বিচারের ভার আপনাদের উপর।



## সাহাবাগণের মর্যাদার স্তর বিন্যাস

সাহাবাগণ (রা.) সকলেই আল্লাহ তা'আলার নিকটতম বান্দা। প্রিয় ও পছন্দনীয়। সকল সাহাবীই হেদায়েতের মাপকাঠি। পুণ্য-আত্মার অধিকারী। সকল সাহাবীদের চরিত্রই পবিত্র ও মাধুর্য পূর্ণ। মহান আল্লাহ তা'আলা সকল সহাবীর ব্যাপারেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। রাসূল ﷺ সকল সাহাবীর ব্যাপারেই আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। দিয়েছেন সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সনদ। সাহাবা সমালোচনাকারীদের অভিসম্পাত করেছেন তিনি। তাদের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। উচ্চারণ করেছেন সাবধান বাণী। সতর্ক করে দিয়েছেন– সাহাবা সমালোচকদের। সুতরাং সাহাবীদের সকলের ব্যাপারেই আমাদের আকীদা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তারা পুত ও পবিত্র। সত্যের মাপকাঠি।

তবে তাদের পরস্পরে তুলনামূলক মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। মর্যাদার স্তর বিন্যাস আছে সাহাবীদের মধ্যে। যেমন সাহাবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। অতঃপর হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)। এ চারজনকে খোলাফায়ে রাশেদা বলে। সত্যনিষ্ঠ চার খলীফা। সাহাবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এ চারজন। তাদের শাসনামলকে স্বর্ণ যুগ বলা হয়। তাদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন– عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

তোমাদের উপর আমার এবং খোলাফায়ের রাশেদার আদর্শ পালন করা জরুরি।

## ২য় স্তর আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ

সকল সাহাবীই জান্নাতী। সাহাবাদের সকলের ব্যাপারেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া আছে। তবে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন রাসূল ﷺ বলেন–

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُبْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدِ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন– আবূ বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী,

যুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান বিন আউফ জান্নাতী, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ বিন যায়দ জান্নাতী, আবূ উবাইদ বিন জাররাহ জান্নাতী।

## ৩য় স্তর বদরী সাহাবী

২য় হিজরি। পবিত্র রমজান মাস। হক বাতিলের সংঘাত। সত্য মিথ্যার লড়াই। বদর প্রান্তর। ইতিহাসের এক চির পরিচিত নাম। ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ এক চির স্মরণীয় ঘটনা। কুফরের দুর্গের উপর প্রথম আঘাত। প্রচণ্ড আঘাত। সে আঘাত আল্লাহর তরফ হতে। রাসূল ﷺ এর নেতৃত্বে। সে আঘাতে কুরাইশদের দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হলো। কুরাইশদের বিনাশ ঘটল। ভেঙ্গে গেল কুরাইশদের মেরুদণ্ড। কুফরি শক্তি খর্ব হলো মারাত্মকভাবে। কুরাইশরা অপুরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হলো। মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস সুচিত হলো। সে যুদ্ধে মুসলমানগণ ছিল দুর্বল। জনবলে দুর্বল, অস্ত্র বলে দুর্বল। তবে মনোবলে ছিল উৎসাহী, সাহসী। তেজোদ্বীপ্ততায় দেদীপ্যমান। পরম শক্তির মহিমায় শির ছিল সমুন্নত। তবে সে শক্তি বৈষয়িক নয়। নয় জাগতিক। সে শক্তির উৎস জনগণ নয়। সে শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوااللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔

আল্লাহ তা'আলা বদরে তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তখন তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। ইসলামের ইতিহাসের ভিত্তি প্রস্তর হয়েছে বদরে। গৌরব দ্বীপ্ত বিজয়ের সূচনা হয়েছে বদর প্রান্তে। বদর একটি গ্রামের নাম। ছিল চির অজানা অচেনা এক গ্রাম। কিন্তু সত্য জয়ের ফলে বদর দখল করে আছে ইতিহাসের এক অমরত্ব আসন। বদরের সেই বিজয়ের উপর ভর করে অনেক বিজয় হয়েছে। অনাগত ভবিষ্যতে আরো অনেকের মুখে বিজয়ের হাসি ফুটবে। এ ঘোষণাও হয়ে গেল বদর প্রান্তে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاذْكُرُوْآ اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔

স্মরণ কর! যখন তোমরা রাজ্যে স্বল্প সংখ্যক ও দুর্বল ছিলে এবং তোমরা আশঙ্কা করতে যে, কাফেররা তোমাদের ছো মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দিলেন। এবং তার সাহায্যে তিনি তোমাদের সাহায্য করলেন এবং পাক বস্তু সমূহ দ্বারা তোমাদেরকে রিজিক দিলেন। সম্ভবতঃ তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে।



সেদিনের সেই ঐতিহাসিক দিবসে যদি মুসলমানদের পতন হতো। যদি মুসলিম জাতি পরাজয় বরণ করত। তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। রাসূল ﷺ সেদিনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন মর্মে মর্মে। তাই আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে রোনাজারী করেছেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিনতি জানিয়েছেন। অনুনয় করেছেন প্রভুর দরবারে। প্রভু গো। হে প্রভু– আজকের এই অগ্নি পরীক্ষায় যদি মুসলিমগণ বিজয় লাভে সক্ষম না হয়। বিজয়ের চূড়ান্ত হাসি যদি তারা হাসতে না পারে। বিজয়ের হিরক সাফল্য যদি আমার এই মুষ্টিমেয় সাহাবীর পদ চুম্বন না করে। তাহলে কি হবে উপায়। ইসলামের পতাকা কারা উড়াবে। কারা ডাকবে তোমাকে। তোমার তাওহীদের বাণী প্রচার করবে কোন সে জামাত। দয়া করে সাহায্য করুন। সহযোগিতা করুন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলের এ দোয়া কবুল করেন- তিনি তার পক্ষ থেকে সাহায্য করেন, ইরশাদ হচ্ছে–

هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۔

তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের মাধ্যমে।

## রহমতের বারিধারা বর্ষণ

যুদ্ধ যখন তুমুল। লড়াই যখন তুঙ্গে। মুসলিম ও কাফের উভয় গ্রুপ যখন মুখোমুখি। ঠিক যখন মুসলিম শিবিরে পানির অভাব দেখা দিল। পানীর তীব্র সংকট সৃষ্টি হলো। গোসল অজুতে পানির সংকট সৃষ্টি হলো। এমন কি পান করার মতো পানির অভাব দেখা দিল। মুসলমানদের এ কঠিন অগ্নি পরীক্ষা চলা কালে শয়তান এসে হাজির হলো। ওছওয়াছা ও কুমন্ত্রণা দিতে লাগল। শয়তান বলতে লাগল, তোমরা তো মুসলিম। তোমাদের মাঝে অবস্থান করছে তোমাদের নবী। তোমরা কাজ করছ ইসলামের। হক আল্লাহর কাজ করছ। অথচ তোমরা পানির সংকটে ভুগছ। তোমাদের আশে পাশে পানি নেই। আর ঐ দেখ তোমাদের প্রতিপক্ষের সন্নিকটে পানি আছে, প্রচুর পানি। শয়তান অব্যাহত কুমন্ত্রণা দিতে লাগল। রাসূল ﷺ সেজদায় পড়লেন। শুরু হলো বৃষ্টি। রহমতের বৃষ্টি। সাহাবায়ে কেরাম গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। পানি পান করলেন। বিভিন্ন পাত্র ভরে রেখে দিলেন। সাহাবীদের বালুকাময় ভূমির বালু জমে গেল। উটগুলো এরপর থেকে সাচ্ছন্দে চলতে লাগল। পক্ষান্তরে কাফেরদের শিবির কর্দমাক্ত হয়ে গেল। এতে তাদের চলতে ফিরতে সমস্যা সৃষ্টি হলো। বদরী সাহাবীদের প্রতি এই গায়েবী মদদের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ -

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। তোমাদেরকে পাক করার লক্ষ্যে এবং তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করার জন্যে। এবং কলবকে তা দ্বারা শক্তিশালী এবং তোমাদের পা মজবুত করার মানসে।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে বদরী সাহাবীদের সরাসরি সাহায্য করেছেন। পরীক্ষাও করেছেন। পরীক্ষা করেছেন– অগ্নি পরীক্ষা। রাসূল ﷺ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সাহাবাগণকে সরাসরি ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ -

যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করেছিলে। তখন তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করলেন– এবং পরপর তোমাদের এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করলাম। –[সূরা- আনফাল]

## ৪র্থ স্তর বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণ

ষষ্ঠ হিজরি। জিলকদ মাসের শুরু লগ্ন। রাসূল ﷺ পবিত্র মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। লক্ষ্য ছিল উমরাহ আদায় করা। সে হিসেবে এহরামও বেধে নিলেন। সাথে আছে সাহাবাদের বিরাট এক কাফেলা। সংখ্যা ১৪ শত/১৫ শত হবে। কাফেলা চলছে। চলছে সম্মুখ পানে। কিছু দূর গিয়ে যাত্রা বিরতি হলো। এলাকার নাম হুদায়বিয়া। মূলত হুদায়বিয়া ছিল একটি কূপের নাম। সে কূপের নামানুসারে এলাকার নাম হয়ে যায় হুদায়বিয়া। কূপ থাকলে ও পানি ছিল না। ফলে পানির প্রয়োজন দেখা দিল। রাসূল ﷺ -এর পবিত্র পদচারণায় পানির ব্যবস্থা হলো। শুকনো কূপে পানি ভরে গেল। কাফেলার সকলে ঐ কূপ থেকে পানি পান করলেন। প্রয়োজন সেরে নিলেন।

হুদায়বিয়া পৌছে নবী করীম ﷺ মক্কায় একজন দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। রাসূল ﷺ দূতকে একটি চিঠি দিয়ে পাঠান। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ। নবী করীম ﷺ এ বৎসর কেবল উমরার জন্য মক্কায় আসছেন। উমরা করে তিনি মদিনায় চলে যাবেন। উমরাহ ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। হযরত উসমান (রা.) মক্কায় পৌছার সাথে সাথে কাফেররা তাকে আটকে ফেলে। এদিকে



একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করা হয়েছে। এ সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ মর্মাহত হন। মারাত্মকভাবে ব্যথিত হন। তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন জেহাদের। মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সংকল্প করেন। সে মতে উপস্থিত সকল সাহাবীদের সমবেত করেন। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন সকলের নিকট। জিহাদের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে অবতরণের ঘোষণা দেন। এ জন্য উপস্থিত সকল সাহাবীর জন্য প্রয়োজন ইস্পাত কঠিন মনোবল। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়বার পর্বত সম সাহস। এমনি মনোভাব ব্যক্ত করে রাসূল ﷺ জিহাদের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। নিজের যত উপস্থিত সকল সাহাবী থেকে ও এমনি প্রত্যয় দীপ্ত প্রতিশ্রুতি কামনা করেন। উপস্থিত সকল সাহাবী স্বতঃস্ফুর্তভাবে সাড়া দেন। সোৎসাহে সানন্দে বরণ করেন রাসূল ﷺ-এর জ্বালাময়ী এ আহ্বান। বায়'আত গ্রহণ করেন রাসূল ﷺ -এর হাতে। ইসলামের পতাকা বুলন্দ করার শপথ গ্রহণ করেন নতুন ভাবে। হাতে হাত রেখে জানিয়ে দেন হে রাসূল! দীনের জন্য ইসলামের কল্যাণে যে কোনো ত্যাগ ও কুরবানি করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা আমাদের জানমাল সব কিছু বিলিয়ে দিতে রাজি। তাদের কথা ও অবস্থায় ফুটে উঠে

"জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত তখনি জানি, শহীদি রক্তে হেসে উঠবে জিন্দেগানী"

সেদিনের সেই বায়'আত পছন্দ হয়েছিল আল্লাহর দরবারে। তিনি খুশি হয়েছেন সাহাবীদের নির্মল প্রত্যয় দেখে। ভালো লেগেছে সাহাবীদের এমনি ত্যাগ ও কুরবানির মানসিকতা। তার এ ভালো লাগা গোপন করতে চাইলেন না। তার ইচ্ছে হলো জানিয়ে দেওয়ার। প্রকাশ করতে চাইলেন সাহাবীদের প্রতি তার মহব্বতের ভালোবাসার বার্তা। যেন পৃথিবী সাহাবীদের কদর ও মর্যাদা বুঝে। অনুধাবন করতে সক্ষম হয় সাহাবীদের অবস্থান। বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মান ও সম্মান যেন বুঝে নেয় উম্মত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا -

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দান করলেন। –[সূরা : ফাতাহ]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণ কারীদের স্বীয় সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। এ কারণেই একে বায়'আতে রিদওয়ান তথা সন্তুষ্টির বায়'আতও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে তাকিদ করা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো– হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন– اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ অর্থাৎ, তোমরা ভূপৃষ্ঠে অবস্থান কারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

عَنْ اُمِّ بَشَرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– যারা এ বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণ করেছে। কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। সুতরাং এ বাইয়াতে অংশ গ্রহণকারীদের মর্যাদা প্রায় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতো হয়ে গেল। বদরী সাহাবীদের গুণকীর্তন করে যেমন আয়াত নাজিল হয়েছে। তেমনি হয়েছে এ ক্ষেত্রেও। আয়াতে যে বৃক্ষের কথা বর্ণনা হয়েছে সেটা ছিল বাবলা বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে যাতায়াত করত। এবং সেখানে নামাজ আদায় করত। হযরত ওমর (রা.) দেখলেন বৃক্ষের নীচে নামাজ আদায়ের এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে ভিন্নরূপ নিতে পারে। অতি উৎসাহী মুর্খ লোকেরা পূজার মতো আনুষ্ঠানিকতায় রূপ দিতে পারে। এ জন্য তিনি এ বৃক্ষটি কেটে ফেলেন।

বাইয়াতে রিদওয়ান সম্পর্কে মূলত নিম্নোক্ত আয়াতটি ১ম নাজিল হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াত নিম্নোক্ত আয়াতের তাকিদ স্বরূপ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

অর্থাৎ, যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। সুতরাং যে শপথ ভঙ্গ করে, অবশ্যই সে নিজের ক্ষতির জন্যই শপথ ভঙ্গ করে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।



## হুদায়বিয়ার সন্ধি

পড়ে জানা গেল সংবাদটি ভুল ছিল। একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত উসমান (রা.) শহীদ হননি। তিনি সুস্থ ছিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ। বরং কুরাইশরা সাহল ইবনে আমরকে পাঠাল সন্ধির শর্তাবলি দিয়ে। রাসূল ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি সন্ধি চুক্তিতে রাজি হন। সংক্ষেপ আলোচনার পর নিম্নের শর্তাবলিতে উভয় পক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

১. মুসলমানগণ এবার [উমরা না করে] ফিরে যাবেন।
২. আগামী বছর এসে শুধু ৩ দিন অবস্থান করে ফিরে যাবেন।
৩. মুসলমানগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসবেন না। যদি তরবারি সাথে থাকে, তাহলে তা উন্মুক্ত করা যাবে না।
৪. মক্কায় অবস্থানকারী কোনো মুসলমান তাদের সাথে যেতে পারবে না।
৫. মদিনায় অবস্থানকারী কোনো মুসলমান যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় তার থাকার অবকাশ থাকবে।
৬. যদি কোনো লোক মক্কা থেকে মদিনায় চলে যায়, তাহলে নবীজী তাকে পাঠিয়ে দিবেন।
৭. কিন্তু মদিনা থেকে মক্কায় কোনো লোক চলে আসলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

এ সকল শর্তাবলি আপাত দৃষ্টিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হলেও সুদূর প্রসারী কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ চুক্তিকে فَتْحٌ مُّبِيْنٌ তথা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এ সফর কালেই সূরা ফাতহ নাজিল হয়। এভাবে নতি স্বীকার করে সন্ধি না করার জন্য বলেছিলেন হযরত ওমর (রা.) সহ বেশ কিছু সাহাবী। কিন্তু রাসূল ﷺ এর চুক্তিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল। ছিল প্রচ্ছন্ন বিজয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন–

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আপনাকে বিজয় দান করেছি। স্পষ্ট বিজয়। যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ত্রুটিগুলো মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তার নিয়ামত পূর্ণ করে দেন। আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আপনাকে সাহায্য করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।

## তাফসীর

আল কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের قَوْل সবচেয়ে অগ্রগণ্য। কেননা তাঁরা রাসূল ﷺ -এর সহচর্যে অবস্থান করে তাঁর পবিত্র মুখে কুরআনের তাফসীর শুনেছেন। পরবর্তীতে এ সাহাবীগণই ইলমে তাফসীর সংরক্ষণ করে একে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ দান করেছেন। এ কাজে অনেক সাহাবী আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অনেকে প্রসিদ্ধিও অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে রঈসুল মুফাসসিরীন বা প্রধান তাফসীরকার বলা হয়। প্রথম যুগে মুসলমানদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা না হলেও নিঃসন্দেহে অন্যতম অভিজ্ঞ আলিম ও কুরআন বিশারদ বলে মনে করা হতো। কুরআনে কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা এবং অন্তর দৃষ্টির দরুণ তাকে رَئِيْسُ الْمُفَسِّرِيْنَ বা প্রধান তাফসীরকার বলা হয়। তিনি এমন সময় কুরআনের ব্যাখ্যা দানে আত্মনিয়োগ করেন যখন মুসলিম সমাজে যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআনুল কারীমের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে এ বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিম্নে সাহাবীদের প্রসিদ্ধ তাফসীরকারগণের নামও রঈসুল মোফাসসিরীনের জীবনী নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

সাহাবাগণের মধ্যে যারা তাফসীর শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাদের তালিকা।

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (র.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ اَلْاِتْقَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ কিতাবে বলেছেন সাহাবাদের মধ্যে যারা তাফসীরে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন ১০ জন।

১. খলীফাতুর রাসূল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।
২. আমীরুল মোমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)।
৩. আমীরুল মোমিনীন হযরত উসমান (রা.)।
৪. আমীরুল মোমিনীন হযরত আলী (রা.)।
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।
৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)।
৮. হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)।
৯. হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)।
১০. হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)।



## প্রধান তাফসীরকার কে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে রঈসুল মুফাস্‌সিরীন বা প্রধান তাফসীরকার বলা হয়। প্রথম যুগে মুসলমানদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা না হলেও নিঃসন্দেহে অন্যতম আলিম ও কুরআন বিশারদ হিসেবে মনে করা হতো। কুরআনে কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা এবং অন্তদৃষ্টির দরুণ তাকে رَئِيْسُ الْمُفَسِّرِيْنَ বা প্রধান তাফসীরকার বলা হয়।

তিনি এমন সময় কুরআনের ব্যাখ্যাদানে আত্মনিয়োগ করেন যখন মুসলিম সমাজে যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা প্রদানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারেই এ বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**জন্ম ও বংশ পরিচয় :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তার গোত্র বনূ হাশিম শিয়াবে আবী তালিবে অন্তরীণ অবস্থায় জীবন যাপন করছিল।

**নাম :** নাম আবদুল্লাহ, উপনাম, আবুল আব্বাস, উপাধি আল হিবর [হিবরুল উম্মাহ] পিতার নাম হযরত আব্বাস (রা.), মাতার নাম ছিল উন্মুল ফজল লুবাবাতুল কুবরা বিনতে হারিছ।

সুতরাং তার বংশ তালিকা এরূপ ছিল– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ইবনে হাশিম, ইবনে আবদে মানাফ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে মহানবী ﷺ -এর সম্পর্ক।

প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাসের খালা ছিলেন। অধিকাংশ সময় ইবনে আব্বাস (রা.) খালা মায়মূনার গৃহে অবস্থান করতেন। কোনো কোনো সময় রাতে এখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন। এ সূত্রে তিনি মহানবী ﷺ -এর খেদমতের সুযোগ পেতেন।

একদা রাতে মহানবী ﷺ নামাজের জন্য সজাগ হন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অজুর পানি এনে রাখেন। রাসূল ﷺ পানি দেখে জিজ্ঞাসা করেন, পানি কে এনেছে? হযরত মায়মূনা (রা.) বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এনেছেন। এতে মহানবী ﷺ খুশি হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে দীনের সঠিক জ্ঞান দাও এবং তাকে ব্যাখ্যার জ্ঞান দাও।

তাফসীর ও হাদীস বিষয়ক ইলমে তিনি গোটা উম্মতের নেতৃত্ব প্রদান করেন। রাসূলের ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১৩/১৫ বছর। ৬৮ হিজরিতে ৭০ বছর বয়সে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় مُحَمَّدُ حَنِيْفَه رح তাঁর শিয়রের নিকট দাঁড়িয়ে দোয়া করেন এবং বলেন مَاتَ الْيَوْمَ حِبْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ -[তারীখে তাফসীর]

**মহানবী ﷺ -এর কৃপা দৃষ্টি :**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ধীশক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দরুন মহানবী ﷺ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ইবনে আব্বাস আগামীতে কি হবেন। নিম্নের ঘটনা থেকেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করেছিলেন– জন্মের পর হযরত আব্বাস (রা.) তাকে সঙ্গে নিয়ে মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হন। মহানবী ﷺ স্বীয় মুখের লালা দ্বারা তাহনিক করে দেন। (اُسْدُ الْغَابَةِ)

একবার মহানবী ﷺ তাকে বক্ষে নিয়ে এভাবে দোয়া করেন–

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি তাকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। (مُسْتَدْرَك حَاكِمْ)

হযরত আবূ নায়ীম হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন।

دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَانْشُرْ مِنْهُ .

**হযরত জিব্রাঈল (আ.) -এর উক্তি :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নিজেই বর্ণনা করে বলেন–

اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ جِبْرِيْلُ اِنَّهُ كَائِنٌ حِبْرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا .

**ইলমে তাফসীরে তার স্থান :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বাল্যকাল হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিয়েছিলেন ৮/১০ বছর। মহানবী ﷺ -এর দোয়া ও সাহাবী (রা.) গণের সাহচর্য লাভ করে অতালান্ত গভীর সমুদ্র সদৃশ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে পড়েন। কুরআন, তাফসীর, ফিকহ, হাদীস, অভিধান, ইত্যাদির মধ্যে এমন কোনো বিষয় ছিল না যাতে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিল না।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন মহানবী ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন– نِعْمَ تَرْجُمَانُ الْقُرْاٰنِ اَنْتَ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) এ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন– نِعْمَ تَرْجُمَانُ الْقُرْاٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ হ্যাঁ, ইবনে আব্বাস (রা.) কুআনের উত্তম ব্যাখ্যা দাতা।



**হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর উক্তি :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন–

اِبْنُ عَبَّاسٍ اَعْلَمُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ .

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তৎসম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

**মুহাম্মদ হুসসান আযযাহাবী (রা.) -এর মত :** মুহাম্মদ হুসসান আযযাহাবী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর জ্ঞানের পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজে তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন– হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে কিতাব ও হিকমার জ্ঞান এবং দীন সম্পর্কে অনুধাবন ও কুরআনের ভাষ্যের জ্ঞান দান কর।

২. নবী পরিবারে তাঁর প্রশিক্ষণ লাভ।

৩. বড় বড় সাহাবীগণের সংসর্গ লাভ।

৪. অসাধারণ স্মরণ শক্তি ও আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান।

৫. ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ। [আততাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন]

আল কুরআন সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে হযরত ওমর (রা.) তাকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা.) -এর পরামর্শ সভার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কঠিন সমস্যায় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন হযরত ওমর। অধিকাংশ সময় তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। তিনি বলতেন, ইবনে আব্বাস তোমাদের সকল অপেক্ষা বড় বিদ্বান। وَهُوَ اَعْلَمُكُمْ হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে আরো বলেন– فَتَى الْكُهُوْلِ তরুণ প্রবীণ- অর্থাৎ বয়সে তরুণ এবং জ্ঞানে প্রবীণ। لَهُ لِسَانٌ سَئُوْلٌ وَقَلْبٌ عَقُوْلٌ তিনি জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী।

**হযরত আলী (রা.) -এর উক্তি :** কুরআনুল কারীমের তাফসীর বর্ণনার সময় মনে হয় যেন এটি একটি স্বচ্ছ পর্দার আড়াল হতে অদৃশ্য বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন।

**ইবনে আব্বাসের কতিপয় তাফসীর :** একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন আসমান ও জমিন যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا হযরত ইবনে ওমর নিজে তার জবাব না দিয়ে তাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং বললেন, তুমি তাঁর নিকট হতে অবগত হয়ে আমাকে জানাবে। অতঃপর সে ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট আগমন করলে তিনি বলেন আসমান

সমূহের رَتْقٌ অর্থ আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না। এবং জমিনসমূহের رَتْقٌ -এর অর্থ হলো, এতে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা فَتْقٌ করে দিলেন। ফলে আসমান হতে বারি বর্ষণ শুরু হলো এবং জমিন হতে উদ্ভিদসমূহ গজাতে লাগল।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা রয়েছে। একদা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সম্পর্কে সাহাবাগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। লোকেরা এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) এর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন– আমি এ আয়াত সম্পর্কে তাই জানি যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জানেন।

উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ অসংখ্য হাদীস রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আরবি মাতৃভাষা হওয়া এবং মহানবী ﷺ -এর পবিত্র সাহচর্য লাভের ক্ষেত্রে সকলে সমান হওয়া সত্ত্বেও সকল সাহাবী কুরআন অনুধাবনে সমমর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। বরং তাদের মধ্যে কয়েকজন এমন বিশেষ বিশেষ সাহাবী ছিলেন যাঁরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ততার সাথে কুরআনের তাফসীর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং তাঁদের এ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি বিশিষ্ট সাহাবীগণ প্রদান করতেন। আর এ দিক থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন সবার শীর্ষে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বিপুল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের তাফসীর ও অন্যান্য ব্যাপারে সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। দিবা রাত্র শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্রয়োজনে কুরআনের কোনো কোনো শব্দের অর্থ অন্য সূত্র হতে জেনে নিতেন।

এক বর্ণনায় স্বয়ং তিনি বলেন যে, فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ অর্থ আমি জানতাম না। একবার ঘটনাক্রমে দু'জন গ্রাম্য বেদুঈন একটি কূপের বিবাদ নিয়ে আমার কাছে আসে। তাদের মধ্যে একজন বলল اَنَا فَطَرْتُهَا অর্থাৎ আমি প্রথমে এ কূপ খনন করেছি। বেদুঈনের একথা শুনার সাথে সাথেই فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ -এর অর্থ আমার জ্ঞানে আসে। এছাড়া কিছু শব্দাবলিও ছিল যার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও উদ্ধার করতে পারেনি। স্বয়ং তাঁর বর্ণনায় আছে– কুরানের চারটি শব্দের অর্থ আমি উদ্ধার করতে পারিনি। সেগুলো হলো اَقِمْ - اَقِلْه - خِتَان - عَلَيْه

অতএব আমরা ফলাফলের বেলাভূমে এসে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলতে পারি যে, রাসূল ﷺ -এর দোয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) حِبْرُ الْاُمَّةِ হতে পেরেছিলেন। কুরআনের তাফসীর ছাড়াও হাদীসে তিনি উম্মতে মুহাম্মদীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। আরবি সাহিত্য ও



কাব্যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। আসলে এসব মর্যাদা মহান আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। যেমন আল্লাহর বাণী– ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ বিশ্বে যতদিন চন্দ্র, সূর্য, তারা নক্ষত্র থাকবে। ততদিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নাম ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

## আস সীরাতুন নাবাবীয়া

ইসলামের সূর্য পবিত্র মক্কায় উদিত হয়ে মদিনার আকাশে কিরণ বিতরণ করতে লাগল। মদিনা শহরটি বহুকাল থেকেই আবাদ ছিল। বহু পূর্বে ইহুদীরা এখানে আগমন করে বসতি স্থাপন করে। তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মদিনা এবং এর নিকটস্থ এলাকায় ছোট ছোট দুর্গ নির্মাণ করে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত থাকে।

## আসহাবে সুফফা

পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে হিজরত করে মহানবী ﷺ মদিনা মুনাওয়ারায় তাশরিফ আনার পরই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। মহানবী ﷺ মদিনায় পৌঁছবার পর সর্বপ্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। হিজরতের পূর্বেই মহানবী ﷺ মুস'আব ইবনে উমায়েরকে শিক্ষক হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেন। হিজরতের পর মহানবী ﷺ অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, প্রতিরোধ, রাজনৈতিক ব্যস্ততা এবং শহর-নগর বিজয়ের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারেও আত্মনিয়োগ করেন। মসজিদে নববীর ইমারত খানার এক অংশ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত রেখে বাকি অংশে শিক্ষা কার্যক্রমসহ বহুবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নির্বাহ করা হতো। মসজিদে নববী সংলগ্ন এই ঐতিহাসিক শিক্ষাকেন্দ্রটি 'সুফফা' নামে পরিচিত ছিল। হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও মহানবী ﷺ মদিনা থেকে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা দূর করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সময় ও শ্রম দিতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেখাশুনা করতেন। তিনি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে 'আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল্-আসকে নিযুক্ত করেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল খুবই সুন্দর। সুফফার আর একজন শিক্ষক ছিলেন উবাদাহ ইবন সামেত (রা.)। তাঁকে লেখাপড়া ও কুরআনুল করীম শিক্ষা দানের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

## সুফফার আবাসিক বিদ্যালয়

হিজরতের পর রাসূল ﷺ -কে মেহমান হিসেবে পাওয়ার জন্য সাহাবাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো। রসূল ﷺ কারো মনে কষ্ট না দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি উটের পিঠে আরোহণ করলেন এবং বললেন; এ উট

যেখানে গিয়ে বসবে সেখানেই আমার আপাতত অবস্থান হবে। রসূল ﷺ -এর উটটি কুবা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে যাওয়ার পর এক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। রসূল ﷺ পাদুকা দ্বারা পুনরায় উটটি চলার ইঙ্গিত দিলে উটটি উঠে দাঁড়াল এবং কয়েক কদম হেঁটে পুনরায় ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল। স্থানটি ছিল উন্মুক্ত ময়দান। ছিল নাজ্জার গোত্রের আয়ত্তাধীন। হযরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মা ছিলেন সেই গোত্রের। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেই অবস্থান করার সুযোগ পেলেন। এ ময়দানের পাশেই ছিল হযরত আবূ আইয়ুব আনসারীর বাড়ি। হুযূর ﷺ সাময়িকভাবে তাঁর গৃহে অবস্থান করলেন। পরে তিনি সেই ময়দানটি ক্রয় করে নেন এবং সেখানে মসজিদে নববী, সুফফা ও পরিবার-পরিজনদের অবস্থানের জন্য কয়েকটি কক্ষ নির্মাণ করেন। সুফফার এই স্থানটি ইলম অর্জনকারী ছাত্রদের আবাসিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রগণ এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য রাসূল ﷺ -এর সান্নিধ্যে সর্বদা পড়ে থাকতেন। এই আবাসিক বিদ্যালয়ের খাবার-দাবার ও শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান রাসূল ﷺ নিজেই করতেন।

### সুফ্ফার (মদিনার ইসলামি জামে'আর) শিক্ষকবৃন্দ

হিজরতের পর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীর বিদ্যাকেন্দ্র এই সুফ্ফা ছিল ইসলামের প্রথম জামে'আ বা বিশ্ববিদ্যালয়। নবী করীম ﷺ ছিলেন এর প্রধান শিক্ষক। অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে হযরত যায়েদ ইব্নে ছাবিত, উবাই ইব্নে কা'ব, আবদুল্লাহ ইব্নে সাঈদ ইব্নু'ল- আস এবং উবাদা ইব্নে সামেত (রা.) প্রমুখ সাহাবী রসূল ﷺ -কে সহযোগিতা করতেন। সুফ্ফার মধ্যে মহানবী ﷺ কিছু নিয়ম-নীতি চালু করেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন 'আরীফ বা প্রতিনিধি থাকতেন। যিনি তাঁর সাথীদের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। এক সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরিফের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) সুফ্ফা বাসীদের খাবারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।

### পাঠ্যসূচি

মদিনার ইসলামি জামে'আর পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল তাওহীদ, রিসালাত, আকীদায় বিশ্বাস, আখিরাত, ইবাদতের নিয়ম-কানুন, জাকাতের বিধান, ব্যবসা সংক্রান্ত আইন, বিবাহ-তালাক, চুক্তি ও সাক্ষ্য আইন, যুদ্ধকৌশল, বিচার বিভাগীয় আইন-কানুন, বিজ্ঞান, ফারাইয ও অংক, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক আইন, সমাজ কল্যাণ, অর্থনীতি ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক



শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, হালাল হারামের সীমারেখা, শিকার, মেহমানদারী, চিকিৎসা, রোগীর পরিচর্যা, পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এককথায় পূর্ণাঙ্গ বৈপ্লবিক জীবন বিধান ইসলামকে শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরা হতো। বিদেশী ভাষা শিক্ষাও পাঠ্য তালিকায় একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত ছিল। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) ফারসী, হিবরু, রোমান ও আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সচিব হিসেবেও কাজ করতেন। মদিনার লেখা-পড়া ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। শিক্ষকগণও কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে মদিনার আনসারগণের অবদান ছিল কল্পনাতীত। কুরআনকে ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণা পরিচালিত হতো। সবকিছুর মূলে ছিল পবিত্র কুরআন।

### সুফ্ফার শিক্ষার্থী

মদিনার প্রথম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ জন ছাত্র দ্বারা আরম্ভ হয়। এরাই পরবর্তীকালে বিশ্বের সেরা জ্ঞানী-গুণীরূপে পরিগণিত হন। সুফ্ফার বিখ্যাত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতিপয় শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করা হলো।

প্রখ্যাত ফকীহ্ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), প্রখ্যাত কারী হযরত সালেম (রা.), প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), প্রখ্যাত সাধক হযরত আবূযর গিফারী (রা.), হযরত সোহাইবরুমী (রা.), হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত আবুদ দারদা (রা.), হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.), মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত বেলাল (রা.), গাসীলুল-মালাইকা হযরত হানযালা বিন্ আবী আমের (রা.), প্রখ্যাত সাধক ও ইরাক বিজেতা হযরত সা'দ বিন্ আবী ওয়াক্কাস (রা.), আর্মেনিয়া বিজেতা হযরত হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা.) প্রমুখ সাহাবী আস্হাবে সুফ্ফা বা সুফ্ফার বিদ্যার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আরবী সুফ্ফা শব্দটির অর্থ হচ্ছে শামিয়ানা, বারান্দা বা বর্ধিত অংশ বিশেষ। মসজিদে নব্বীর সাথেই এই অংশটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

### আসহাবে সুফ্ফার অবস্থা

সাহাবীদের অধিকাংশই কায়-কারবার ধর্মীয় কাজ, ব্যবসা ও কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তাদের মাঝে কিছু লোক সম্পূর্ণরূপে সংসার বিরাগী হয়ে নিজেদের ইবাদত বন্দেগী ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হতে ইল্‌ম শিক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। তারা সুফ্ফায় দিবা নিশি অবস্থান করতেন। তাদেরকেই আসহাবে সুফ্ফা নামে অভিহিত করা হয়।

তারা দিবাভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির থাকতেন। হাদীস শুনতেন এবং রাতে সুফফার গৃহে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। এদের মধ্যে কেউ বিয়ে করলে এই হালকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেন। এদের মাঝে একজন কাঠুরিয়া জঙ্গল হতে কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতেন এবং এর দ্বারা অন্যান্য সাথীদের জন্য সামান্য আহার্য্য সামগ্রী জোগাড় করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

একই সাথে তাদের কারো চাদর এবং লুঙ্গি ছিল না। চাদর গলায় এমন ভাবে বাধতেন তা হাটুদেশ পর্যন্ত ঝুলে পড়ত। অধিকাংশ আনসার খেজুর গুচ্ছসহ গাছ থেকে এনে তা ছাদে ঝুলিয়ে দিতেন। খেজুর ঝরে পড়ত, আর তারা সেগুলো কুড়িয়ে খেতেন। কখনো দু'তিন দিন পর্যন্ত কোনো খাদ্য মিলত না। অধিকাংশ সময় মহানবী ﷺ নামাজের সময় তাশরিফ আনতেন তারাও নামাজে শরিক হতেন। কিন্তু ক্ষুধা কাতর অবস্থায় কখনো কখনো নামাজ অবস্থায় ঢলে পড়তেন। দূর থেকে যারা আসতেন তারা এদের পাগল বা রোগী মনে করতেন।

মহানবী ﷺ -এর নিকট কোনো সদকার খাদ্য আসলে তিনি তা সরাসরি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর যখন দাওয়াতের খাদ্য আসতো তখন তিনি আহলে সুফফাদের ডেকে এনে তাদের নিয়ে আহার করতেন। কোনো কোনো দিন তাদেরকে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

হযরত সা'দ বিন ওবাদা (রা.) খুবই ধনী এবং দয়ালু ছিলেন। তিনি কখনো আশিজন মেহমান ও সাথে করে নিয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল মেহমানদের প্রতি খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাদের জন্য একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট ছিল আহলে সুফফাগণ শিক্ষকের নিকট গিয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করত। রাতে তারা ইবাদত করতেন। তাদের অধিকাংশকেই কারী বলা হতো ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজে যখন কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন হতো তখন তাদেরকেই প্রেরণ করা হতো।

মাউনার যুদ্ধের প্রাক্কালে এদের সত্তর জনকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা কখনো বাড়ত আবার কখনো কমত। তাদের সর্বমোট সংখ্যা চারশত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু কোনো সময়েই এক সাথে এই সংখ্যা ছিল না। পরিশেষে বলা যায় যে, আসহাবে সুফফার জীবন এক অভূতপূর্ব বৈরাগ্য জীবন। তারা সংসার থেকে নির্লিপ্ত ছিলেন।



**সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে দোষ-ত্রুটি থেকে বাচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক অবস্থা**

কুরআনে কারীমের মুখাতাব সম্বোধিত সত্তা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। তাদের মান-মর্যাদা সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সাহাবায়ে কেরাম যেন বিপদে না পড়েন। কোনো না কোনোভাবে যেন কোনো অসংযত কিছু তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। নিম্নে আয়াত গুলোতে এমনি একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ـ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ـ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ـ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۤءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ مَعَرَّةٌ শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যতঃ সঙ্গত। কারণ যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হতো, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাস্কর ব্যাপার হতো। কাফেররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দীনি ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হতেন।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন– অজ্ঞাতসারে এক মুলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহতো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই। ভুলবশতঃ হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর সাহাবীদেরকে এ থেকে নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুল ভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ

আল্লাহ জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্যে এসব আয়োজন করা হয়েছে।

تَزَيَّلَ - لَوْ تَزَيَّلُوْا শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এ যে, মক্কায় আটক মুসলমাগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হতো এবং মুলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হতো। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ-নারী কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধও মওকুফ করে দিলেন।

## মুহাজির সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব

মহান আল্লাহ তা'আলা মুহাজির সাহাবা প্রসঙ্গে বলেন–

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -

[রাসূল ﷺ -এর নিকট গচ্ছিত আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ] ধন সম্পদ ত্যাগী নিঃস্বদের জন্য যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে তারাই সত্যবাদী।

**মুহাজিরদের ১ম গুণ :** উক্ত আয়াতে মুহাজিরদের ১ম গুণ বর্ননা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। নিজ সহায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারা ইসলাম, মুসলমান ও আল্লাহর রাসূলের সমর্থকও সাহায্যকারী। এটাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ। এ অপরাধেই তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হয় তাদের উপর। পরিশেষে নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে নিজ মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ বাস্তভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বাধেন। কেউ কেউ শীতবস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতেন।
–[তাফসীরে মাযহারী ও কুরতুবী]

**মুহাজিরদের ২য় গুণ :** ২য় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন– يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তারা কোনো জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি। বৈষয়িক কোনো কিছুর লোভে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ



ত্যাগ করেননি। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার অনুগ্রহই একমাত্র কাম্য ছিল। এ থেকে তাদের পূর্ণ আন্তরিকতা বুঝা যায়। فَضْل শব্দটি সাধারণত পার্থিব নিয়ামতের জন্য ব্যবহার হয়। رِضْوَا শব্দটি ব্যবহার হয় পারলৌকিক নিয়ামতের জন্য। কাজেই অর্থ এই দাড়ায় যে, তারা তাদের সাবেক ঘর বাড়ি , বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়মত কামনা করছেন।

**মুহাজিরদের ৩য় গুণ :** يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলকে সাহায্য করার জন্য তারা উপরিউক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য করার অর্থ তার দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা বিস্ময়কর।

**মুহাজিরদের ৪র্থ গুণ :** اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ অর্থাৎ তারাই সত্যবাদী , সত্যনিষ্ঠ কথা ও কাজে। ইসলামের কালেমা পাঠ করে তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন । উক্ত আয়াত সত্য দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী। মিথ্যার লেশ মাত্র ছিলনা তাদের মাঝে। অতএব কোনো ব্যক্তি বা দল যদি তাদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলার ধৃষ্ঠতা দেখায়। তাহলে সে এ আয়াত অস্বীকারকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। পরিণামে মুসলমানের খাতা থেকে তার নাম বাদ পড়ে যেতে পারে। [নাউযুবিল্লাহ] রাসূলে কারীম ﷺ এ দরিদ্র মুহাজিরদের অসিলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতেন। এতে ই বুঝা যায় যে , হুজুর ﷺ এর কাছে তাদের মর্যাদা কত ছিল? –[মাযহারী]

## আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব

মহান আল্লাহ তা'আলা আনসার সাহাবীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেন–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা মুহাজিরগনের আগমণের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং সে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল । তারা মুহাজিরদের ভালোবেসে, মুহাজিদের যা দেওয়া হয়েছে তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলে ও মুহাজিরদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। –[সূরা হাশর]

**আনসারদের ১ম গুণ :** وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ অবস্থান গ্রহণ করা, دَارٌ বলে হিজরতের স্থান তথা পবিত্র মদিনাকে বুঝানো হয়েছে। এ জন্য ইমাম মালেক (র.) মদিনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তার বক্তব্য ছিল দুনিয়ার যে সব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে । সে গুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে । এমনকি মক্কা মুকাররমাও, একমাত্র মদিনা শহরই স্বপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে। –[কুরতুবী]

আয়াতে تَبَوَّءُوا ক্রিয়া পদের دَارٌ-এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ অবস্থান গ্রহণ কোনো স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। ঈমান কোনো জায়গা নয় যে এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই তো কেউ বলেন , এখানে تَمَكَّنُوْا ব خَلَصُوْا ক্রিয়া পদ উহ্য আছে। এখন অর্থ হবে এরূপ যে, তারা মদিনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন । ঈমান খাটি ও পাকাপোক্ত হয়েছে। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমান কে রূপক অর্থে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ মুহাজিরগণের পূর্বে, এতে আনসারগনের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ননা করা উদ্দেশ্য। তা হলো যে শহর দারুল ঈমান ও দারুল হিজরত হওয়ার ছিল। তাতে আনসারদের অবস্থান মুহাজিরগণের পূর্বেই হয়েছিল। মুহাজিরগণ এখানে আসার পূর্বেই তারা ঈমান এনে খাটি ও পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

**আনসারদের ২য় গুণ :** يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ তারা তাদেরকে ভালোবাসে, যারা হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থি। সাধারণতঃ লোকেরা ভিটা মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না । সর্বত্রই দেশি ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাদেরকে স্থানই দেননি; বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন। নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন। অভাবনীয় ইজ্জত ও সম্মানের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্য এক সাথে কয়েকজন আনসার আবেদন জানিয়েছেন। ফলে লটারীর মাধ্যমে এর নিস্পত্তি করতে হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

**আনসারদের ৩য় গুণ :** وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا আয়াতে কারীমায় حَاجَةً প্রয়োজনীয় বস্তু এবং مِمَّا اُوْتُوْا -এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের সারমর্ম হলো মুহাজিরদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে সম্মান মর্যাদা দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের বিজিত এলাকা



থেকে অর্জিত যে সম্পদ মুহাজিরদেরকে দিয়েছেন এতে আনসারদের কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ ছিল না। বরং আনসারগণ বিষয়টি সানন্দে গ্রহণ করেছেন। যেন এসব জিনিসের তাদের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ মনে করা বা অভিযোগ করার তো প্রশ্নই উঠে না।

**আনসারদের ৪র্থ গুণ [অগ্রাধিকার] :** وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ এখানে خَصَاصَةٌ শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস, اِيْثَار -এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরদের অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত দারিদ্র্য পীড়িত ছিলেন। আনসারগণ সফল কাম।

## হাদীস চর্চায় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

রাসূল ﷺ ছিলেন ইলমের খাযানা। সে খাযানার গচ্ছিত সম্পদ ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। রাসূল ﷺ ছিলেন সাহাবীদের আদর্শ। এ আদর্শ অনুসরণ অনুকরণ করে সাহাবায়ে কেরাম ধন্য হয়েছিলেন। রাসূল ﷺ -এর আলোতে আলোকিত হয়ে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবাদের উপর রাসূল ﷺ -এর সেই বিচ্ছুরিত আলোই পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে আলো যেখানে যার উপর পড়েছে সেই ধন্য হয়েছে। এজন্যই বলা হয় সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি উম্মতের জন্য। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল আদর্শ অনুসরণে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ সদা তৎপর। সাহাবাদের পক্ষ থেকে রাসূল আদর্শ গ্রহণের বিভিন্ন দিক থেকে অন্যতম একটি হলো হাদীস সংগ্রহ করা। হাদীস চর্চা করা। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ থেকে হাদীস সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সদা তৎপর থাকতেন। যেমন হযরত ওমর (রা.) তার বাড়ি তুলনামূলক উচু ভূমিতে ছিল। ফলে প্রতিদিন আসতে পারতেন না। প্রতিদিন আগমন করা বেশ কষ্ট হতো। তবে মনে ব্যথা ছিল, ছিল দুঃশ্চিন্তা-হাদীস ছুটে যাওয়ার আশংকায়, যে দিন আসা হয় না সেদিনের হাদীস ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায়। অবশেষে প্রতিবেশী ইতবান ইবনে মালিক (রা.) -এর সাথে সমঝোতা চুক্তি করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) যেদিন সম্ভব হতো না সেদিন তিনি প্রতিবেশী ইতবানকে পাঠিয়ে দিতেন। লক্ষ্য ছিল একটাই যেন কোনো হাদীস ছুটে না যায়। এভাবে পালাক্রমে যাতায়াত হতো। একজন অপর জনের সাথে হাদীস পারস্পরিক আলোচনা পর্যালোচনা করে নিতেন। –[সহীহ বুখারী]

বছরের পর বছর অপেক্ষাও কোনো বিরক্তির কারণ ছিল না। প্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর বাণী শ্রবণ ও জানা মণি-মুক্তার মতো ছিল। মণি-মুক্তাও তাদের আগ্রহের কাছে হার মেনেছিল। যেমন– হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) -এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, চরিত্র কি জিনিস। এর তাৎপর্য-সরল ব্যাখ্যা জানার প্রতি ছিল আমার ব্যাপক কৌতুহল। এ জন্য আমি রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হলাম। অবস্থান করতে লাগলাম। লক্ষ্য ঐ একটাই। আমার ধারণা ছিল অন্যান্য আগন্তুকের কথার ফাকে ফাকে আমার বিষয়টিও পরিস্কার হয়ে যাবে এভাবে একটি বছর কেটে গেল। অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম হে রাসূল! ছওয়াবের কাজের হাকীকত কি জিনিস? তথা তাৎপর্য কি? তিনি উত্তর দিলেন। ছওয়াবের কাজ বলতে সচ্চরিত্র জনিত কাজকে বুঝায়। আর গুনাহ হলো– এমন কাজ যেটি তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। মানুষের কাছে প্রকাশ পাওয়াটা তোমার নিকট অপছন্দীয় মনে হয়। –[সহীহ মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কোনো এক প্রেক্ষাপটে নিজের হাদীস চর্চার প্রসঙ্গ টেনে এই আশঙ্কায় বলেন, সকলে যখন কাজে ব্যস্ত অর্থাৎ জমিনে ছড়িয়ে পড়েন, তখনো আমি থাকতাম সুফফায়। না জানি কোন মূহূর্তে রাসূল ﷺ কি বলে ফেলেন, আর আমি আবূ হুরায়রা বঞ্চিত হয়ে পড়ি। হযরত ﷺ কোনো কিছু বললেই আমি তাৎক্ষণিকভাবে তা মুখস্থ করে নিতাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর মধ্যকার সন্ধান করা সময় নষ্ট করার মতো মনে হতো। তাই তিনি সদা পড়ে থাকতেন মসজিদে নববীতে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। রাসূল ﷺ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে উত্তর দিতেন। একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল ﷺ -কে প্রশ্ন করেন– হে রাসূল! কিয়ামত দিবসে আপনার শাফা'আত দ্বারা কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে? নবী করীম ﷺ বলেন, আমি জানি তোমার আগে এ প্রশ্ন কেউ করতে পারবে না। কারণ ইলম শিক্ষার প্রতি তোমার যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করছি। –[আবূ দাউদ]

রাসূল ﷺ -এর বিবিগণের মধ্যে রাসূল ﷺ -এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন মা আয়েশা (রা.)। তিনি কাছে থেকে রাসূল ﷺ -এর পারিবারিক জীবনটি লক্ষ্য করেছেন। পারিবারিক জীবনে রাসূল ﷺ -এর নকল হরকত ভালোভাবে খেয়াল করতেন ও স্মরণ রাখতেন। হাদীস শাস্ত্রে এমন অনেক নজির আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) অনেক হাদীস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলে সংশোধন করে দিয়েছেন। মূলত রাসূল ﷺ -এর পারিবারিক জীবন অধ্যায়টি আমরা জেনেছি নবী করীম ﷺ -এর বিবিগণের কল্যাণে-ই। হযরত মায়মূনা (রা.) ছিলেন হযরত ইবনে



আব্বাস (রা.)-এর খালা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মাঝে মাঝে খালার বাড়িতে যেতেন। প্রায়ই যেতেন স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি যেতেন। কারণ ছিল একটাই পারিবারিক জীবনে রাসূল কেমন তা প্রত্যক্ষ করা। বিশেষ করে রাত্রিতে হযরত ﷺ কি কি নামাজ পড়েন তা সরাসরি দেখা। –[আবূ দাউদ]

## দূর থেকে দূরে সফর

রাসূলের জন্য সাহাবীদের যেমন ভালোবাসা ছিল তেমনি ভালোবাসা অনুরাগ ছিল হাদীসের প্রতিও। রাসূল ﷺ -এর জন্য সাহাবীগণ যেমন মারাত্মক থেকে মারাত্মক ঝুকি নিতে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করতেন না তেমনি একটি হাদীসের জন্য যে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক টুকরা হাদীস সংগ্রহ কিংবা সনদ শক্তিশালী করার জন্য হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করা ছিল তাদের জন্য মামুলি ব্যাপার। যেমন মিসরের গর্ভনর ছিলেন ফুযালা ইবনে উবায়দ (রা.)। প্রিয় নবী করীম ﷺ -এর সাহাবী দীর্ঘ সফর শেষ করে তার কাছে যান। প্রথম সাক্ষাতেই সাহাবী (রা.) বলেন, আমি দীর্ঘ সফর করে কেবল আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আসিনি। আমি এসেছি একটি হাদীসের সনদ শক্তিশালী করার জন্য। আপনি ও আমি একসাথে একটি হাদীস শ্রবণ করেছিলাম। এ প্রসঙ্গটি সুনিশ্চিত করে নেওয়াই আমার এ দীর্ঘ সফরের লক্ষ্য। –[আবূ দাউদ]

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন উনায়স (রা.) বাস করতেন মিসরে। তার নিকট গল্পকার সম্বন্ধে একটি হাদীস সংরক্ষিত ছিল। হযরত জাবের (রা.) একথা জানতে পারেন। হাদীসটি সংরক্ষণের জন্য হযরত জাবের (রা.) সুদূর মিসরে চলে যান। মিসর গিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে আব্দুল্লাহ বিন উনায়স (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে পৌঁছেন। হযরত বিন উনায়স (রা.) হযরত জাবেরকে দেখে আবেগ আপ্লুত হন। সালাম মুসাফাহ মু'আনাকা শেষে আরজ করেন সুদীর্ঘ এ কষ্টের সফর কেন? হযরত জাবের (রা.) বলেন, গল্পকারদের সম্বন্ধে আপনার নিকট একটি হাদীস সংরক্ষিত আছে বলে শুনেছি। এই হাদীসটি সচরাচর শুনতে পাই না। তাই মনে বেশ আশা জাগল হাদীসটি আপনার মুখ থেকে শুনতে। কারণ কে কখন ইন্তেকাল করেন বলা যায় না। আমাদের দু'জনের কারো মৃত্যু আসার আগে আগেই হাদীসটি শ্রবণ করে নেওয়া আমার জন্য জরুরি মনে করেছি বলেই দীর্ঘ সফর করে হাদীস শ্রবণে পৌঁছে গেছি এই মিসরে। –[সহীহ বুখারী]

একদা রাসূলে কারীম ﷺ একটি হাদীস বর্ণনা করেন, উপস্থিত ছিলেন দু'জন সাহাবী (রা.)। হযরত উকবা (রা.) ও হযরত সায়িব (রা.)। পরবর্তীতে হযরত সায়িবের মনে হাদীসটির কোনো এক অংশে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন আমার সাথে হযরত উকবা বিন আমের জুহানী (রা.)ও এ হাদীসটি শ্রবণ করেছিলেন। সুতরাং তার নিকট থেকেই সন্দেহ দূর করা সম্ভব। আর হযরত উকবা বিন আমের জুহানী (রা.) বাস করতেন মিসরে। সে হিসেবে হযরত সায়িব সুদূর মিসরের পথে যাত্রা শুরু করলেন। মিসরে গিয়ে তিনি প্রথমে হযরত মাসলামা (রা.) -এর বাড়িতে উঠেন। হযরত মাসলামা (রা.) তাকে পেয়ে আদর আপ্যায়ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত সায়িবের ব্যাকুলতা ছিল হাদীস সন্দেহ মুক্ত করার প্রতি। তাই তিনি বললেন, ভাই প্রথমে আমাকে হযরত উকবার ঠিকানা দাও। আগে তার সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি সন্দেহ মুক্ত করি। আমার হৃদয়ের ছটফটানি ভাব দূর করি। তার পর আপ্যায়ন, মেহমানদারি সব করা যাবে। হযরত উকবা বাস করতেন গ্রামাঞ্চলে, বেশ দূরে। ঠিকানা বুঝে নিয়ে হযরত সায়িব (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওয়ানা হয়ে গেলেন সেই গ্রাম অভিমুখে, হযরত উকবার সন্ধানে। এক পর্যায়ে তিনি হযরত উকবাকে পেয়ে যান। কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণ করেন। দু'জন মত বিনিময় করে হাদীসটি থেকে সন্দেহ দূর করেন।

এমনি অনেক ঘটনা আছে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর। তারা হাদীসের জন্য দূর থেকে বহু দূরে সফর করেছেন। পরিশ্রম করেছেন মেহনত করেছেন।

## হাদীস সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরামের অপরিসীম গুরুত্ব

হাদীস সংরক্ষণে সাহাবাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। রাসূল ﷺ -এর প্রতিটি কথা, বাক্য, ইচ্ছা করে ভেসে যাওয়ার অবকাশ ছিল না বা রাসূল ﷺ -এর পবিত্র মুখ থেকে একটি কথা বের হতে না হতেই সাহাবীগণ তা গিলে ফেলতেন। চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়ে থাকতেন সাহাবাগণ (রা.)। কথাটি কখন কিভাবে বের হয় সাদেক মাসদূকের কণ্ঠে। কেমন করে উচ্চারণ করেন প্রিয় নবী তার অমীয় বাণী। উচ্চারণ ভঙ্গিসহ আত্মস্থ করতেন আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। উপস্থাপনা কৌশলসহ হৃদয়ঙ্গম করতেন মহানবীর বক্তব্য, নসিহত ও দিক নির্দেশনা। ছোট থেকে ছোট কোনো একটি কথাও হারিয়ে যেতে দেননি তৎপর সাহাবাগণ (রা.)। কথার পাশাপাশি মহানবীর কর্ম কৌশলও স্মৃতির পাতায় ধরে রেখেছেন সাহাবাগণ (রা.)। এমনকি রাসূল ﷺ -এর বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন



থেকেও অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং হুবহু ঠিক সেভাবেই তা উম্মতের নিকট পরিবেশন করে গেছেন। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

জনৈক সাহাবী বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি রাসূল ﷺ কথার ফাকে ফাকে ইস্তেগফার পড়তেন। আমি গণনা করে দেখি রাসূল ﷺ ঐ মজলিশে একশত বার ইস্তেগফার আদায় করেছেন। –[আবূ দাউদ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি আমার রাত্রিকে তিনভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে নিদ্রা, দ্বিতীয় ভাগে নামাজ, তৃতীয় ভাগে প্রিয় নবী ﷺ -এর হাদীস মুখস্থ করার কাজে ব্যয় করি। তোমরাও এরূপ আমল কর। –[দারেমী]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল আপনি আমাদেরকে হাদীস লিখার অনুমতি দিচ্ছেন না কেন। তিনি বললেন, আমি কুরআনের ন্যায় হাদীস লেখার অনুমতি কিভাবে দিব। তবে তোমরা হাদীস মুখস্থ করে নাও। আমরা হাদীস সংরক্ষণ করেছি মুখস্থ করার মাধ্যমে। কুরআনের পর হাদীস হলো শরিয়তের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। হাদীসের নিরিখেই শরিয়তের যাবতীয় হুকুম আহকাম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সে মতে সাহাবীগণ (রা.) হাদীস বর্ণনায় অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে কোনো কোনো সাহাবী অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) তার পিতাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অন্যান্য সাহাবীর ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, রাসূল ﷺ -এর সাথে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল কিন্তু আমি তার কাছে শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি কোনো মিথ্যা নিসবত করবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম করে নিল। –[আবূ দাউদ]

সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে কোনো কোনো সাহাবীর অবস্থা এমন ছিল যে, কয়েক বছরের মধ্যেও কোনো হাদীস উচ্চারণ করেননি। ইমাম শাফী (র.) বলেন, আমি দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) -এর নিকট ছিলাম। অথচ তাকে একবারও হাদীস উচ্চারণ করতে দেখেনি।

হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান, হযরত সাদ, হযরত তালহা ও হযরত মিকদাদ (রা.) -এর সমসাময়িক ছিলাম। একমাত্র হযরত তালহা (রা.)-কে হাদীস বর্ণনা করতে দেখেছি। তিনিও কেবল উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত হাদীসই বর্ণনা করতেন। –[সহীহ বুখারী]

হযরত সায়িব ইবনে ইয়াছিব (রা.) বলেন, আমি মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ হযরত সাদের সাথে অতিক্রম করেছি। কিন্তু হযরত সাদকে একটি হাদীসও বর্ণনা করতে দেখিনি।

হাদীস বর্ণনায় ভুল হয়ে যায় কি-না এজন্য অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা থেকে ওজর পেশ করতেন। একদা ইয়াযিদ বিন আকরাম (রা.)-কে লোকজন হাদীস শুনানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাদের নিকট ওজর পেশ করে বলেন, হাদীস বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমার বয়স হয়ে গেছে এ সময়ে হাদীস বর্ণনায় ভুল হয়ে যেতে পারে।

সচরাচর যারা হাদীস বর্ণনা করতেন তারাও বেশ সতর্কতার সাথে বর্ণনা করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, প্রিয়নবীর এই হাদীস "যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার নিবাস জাহান্নামে করে নেয়" আমাকে অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত রাখে। -[সহীহ বুখারী]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন হেতু মাসে কেবল দুই থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করতেন। হযরত ওমর (রা.) রীতি মতো হাদীস বর্ণনার আধিক্য থেকে সাহাবীদের নিষেধ করতেন। নবী করীম ﷺ -এর দিকে হাদীসের নিসবত করতে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বেশ ভয় করতেন। হযরত আমর ইবনে মায়মূন বলেন, আমি বৃহস্পতিবার হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) -এর নিকট যেতাম। সাধারণত তাকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখা যেত না। একদিন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, এতটুকু বলা মাত্রই তার গ্রীবাদেশ নুয়ে গেল। আমি দেখলাম তার জামা সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেছে। আর গ্রীবাদেশের রগগুলো ফুলে মোটা হয়ে গেছে। এমনি অবস্থায় অত্যন্ত সতর্কার সাথে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বর্ণনা শেষে সতর্কতা স্বরূপ তিনি বলেন, এ বাক্যে অথবা কাছাকাছি বাক্যে বা এ ধরনের বাক্যে প্রিয়নবী কথাটি বলেছেন। -[আবূ দাউদ]

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হাদীস বর্ণনায় ভীত হয়ে যেতেন। হাদীস বর্ণনা শেষে أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ অনুরূপ কিংবা যেরূপ তিনি বলেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার মাথার উপর আসমান ভেঙ্গে পড়াকে যেমন কঠিন মনে করি তেমনি হাদীস বর্ণনাকেও কঠিন মনে করি। -[সহীহ মুসলিম]

সাহাবাগণ (রা.) হাদীস বর্ণনায় যেমনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন তেমনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। হযরত আলী (রা.) বলেন



আমার নিকট কেউ হাদীস বর্ণনা করতে এলে রীতিমতো আমি তাকে আল্লাহর নামে শপথ করিয়ে নিতাম।

উম্মতের সর্দার হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন একজন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। স্বাভাবিক জীবন যাপনে তিনি কারো সাথে কঠিন আচরণ করতেন না। বিনয় ও নম্র আচরণ ছিল তার মজ্জাগত ও স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। সেই অনুপম বিনয়ী সাহাবী হাদীস গ্রহণে কঠিন হয়ে যেতেন। কেউ বললেই তা গ্রহণ করে নিতেন না। যাচাই করে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে হাদীস গ্রহণ করতেন। যেমন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) একদা একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি ছিল দাদীর মিরাশ সম্পর্কিত। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, হাদীসের সপক্ষে সাক্ষী পেশ কর। হযরত মুগীরা (রা.) সাক্ষী পেশ করেন। সাক্ষী ছিল হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)। সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) হাদীসটি কবুল করেন, এবং সত্য বলে স্বীকার করেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো হাদীস বর্ণনাকারী সকলেই ছিলেন সাহাবী। যারা কুরআন হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত। যাদের সততা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। যাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ সনদ দিয়েছেন। হাদীস বর্ণনাকালে এদিক সেদিক কল্পনাও করা যায় না, এ বিশ্বাস সাহাবীদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। ভালোভাবেই ছিল। অর্থাৎ, তারা হাদীস বর্ণনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এতে শিক্ষা রয়েছে উম্মতের জন্য সকল মানুষের জন্য। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যেন সামান্যতম সন্দেহের ধুয়া তুলতে না পারে সে জন্য সব ধরনের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অতএব, হাদীসের শুদ্ধতার উপর সন্দেহ মুক্ত অকৃত্রিম বিশ্বাস ঈমান পূর্ণতা বিধানে অপরিহার্য।

## সাহাবীদের দরসে হাদীস

রাসূল ﷺ -এর অগণিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে এটি হাদীস হলো- بَلِّغُوا عَنِّي ولو اية "একটি কথা হলেও আমার পক্ষে থেকে পৌঁছে দাও" অর্থাৎ যে কেউ অনেক কিছু হয়তো জান না, অল্প জান, একটি মাত্র হাদীস জান, তা-ই পৌঁছে দাও। জেনে নিজের কাছে গোপন রাখবে না। মানুষের কাছে পৌঁছে দিবে এটিই ছিল রাসূল ﷺ -এর বাণীর লক্ষ্য। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ -এর প্রতিটি কথার উপর আমল করতেন। মহানবীর প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ

অনুকরণ করতেন আন্তরিকতার সাথে, গুরুত্বের সাথে। সে হিসেবে উপরিউক্ত হাদীসের উপরও তারা আমল করেছেন নিষ্ঠার সাথে। যার কাছে যে হাদীস সংরক্ষিত ছিল তিনি তা নিয়েই দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। মানুষের কাছাকাছি চলে গেছেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন, সে দরসে হাদীসে মানুষও স্বতস্ফূর্তভাবে আগমন করেছেন। হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন মনযোগ সহকারে। এ জাতীয় কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো।

মুহতারাম আবূ ইদরীস খাওলানী (র.) বলেন, একদা আমি হিমসের একটি জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করে দেখি জমজমাট একটি শিক্ষার আসর চলছে। সে শিক্ষার আসরে ৩২জন সাহাবী ছিলেন। তারা সেখানে রাসূল ﷺ -এর কাছ থেকে শোনা হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন।

এমনিভাবে নজর ইবনে আসীম লাইসী (র.) বলেন, একদা বহু সংখ্যক লোকের এক বিরাট জমায়েত দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে একজন কথা বলছেন। বাকিরা তা কান পেতে মনোযোগ সহকারে শুনছেন। মজলিস সম্পর্কে জানতে কৌতূহল সৃষ্টি হলো। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম হাদীসের দরস চলছে। দরস পরিচালনাকারী একজন সাহাবী। তার নাম হযরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.)। -[মুসনাদে আহমদ]

হযরত আবুদ দারদা (রা.) দামেস্ক শহরে বাস করতেন। তিনি যখন হাদীস শিক্ষা দানের জন্য মসজিদে গমন করতেন তখন মসজিদে উপচে পড়া ভিড় পড়ে যেত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতো মসজিদে কোনো সম্রাটের আগমন ঘটেছে। -[তাযকিরাতুল হুফফাজ]

হাদীস সংগ্রহে সাহাবীদের যেমন সীমাহীন কৌতূহল ছিল। তেমনি আগ্রহ ছিল হাদীস শিক্ষাদানে। কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্তেও হাদীস শিক্ষাদানের জন্য ছিল মানসিকভাবে প্রস্তুত। একটি হাদীস শিক্ষা দান ও প্রচার করতে পারার মাঝে নিজেদের জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পেত। যেমন বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমাকে যদি কেউ হত্যা করতে আসে। আর আমি বুঝতে পারি যে, নিহত হওয়ার আগে প্রিয় নবীর একটি হাদীস শুনানোর সুযোগ আছে। তাহলে আমি ঐ মুহূর্তেও হাদীসটি শিক্ষা দিব, প্রচার করব। -[সহীহ বুখারী]

বিভিন্ন লোকজন সাহাবীদের কাছে হাদীস জানতে চাইলে সাহাবীগণ সাধুবাদ জানাতেন। উৎসাহে আনন্দে গ্রহণ করতেন তাদের আবেদন। অকাতরে হাদীস পরিবেশনার মাধ্যমে হাদীস শিক্ষা গ্রহণকারীদেরকে আরো বিপুলভাবে উৎসাহিত



করতেন। যেমন হযরত আবূ হারওয়ান আবাদী (র.) বলেন, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর নিকট যখন কোনো ব্যক্তি হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য আগমন করত তখন তিনি আগন্তুককে মারহাবা বলে সাদরে গ্রহণ করতেন। আর বলতেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করে গেছেন, লোকজন দূর দূরান্ত থেকে তোমাদের নিকট হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য আসবে। তোমরা তাদের কদর করবে, মূল্যায়ন করবে। তাদের সাথে সদাচার ও কল্যাণকামীতার ব্যবহার করবে। বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, একবার আমরা কতিপয় লোক হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর কাছে গেলাম। লক্ষ্য ছিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর খোজ-খবর নেওয়া, সেবা শুশ্রূষা করা। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ঘরের ভিতরে ছিলেন। লোকজন গৃহে প্রবেশ করলে তিনি আগমনকারীদের সম্মানার্থে পা গুটিয়ে নিলেন। সাথে সাথে তিনি আরজ করেন, একদা আমরা কয়েকজন রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম। ঐ সময় মহানবী ﷺ শুয়ে ছিলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি এভাবে পা গুটিয়ে বললেন, আমার পর তোমাদের নিকট বিভিন্ন লোকজন হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য আসবে। তোমরা তাদেরকে মারহাবা বলে অভিবাদন করবে এবং তাদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে। -[ইবনে মাজাহ]

সাহাবীগণ হাদীস শিক্ষার্থীদের যাচাই করার দৃষ্টান্তও রেখে গেছেন। আগমনকারীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে যাচাই করতেন। যেমন হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর নিকট মদিনা থেকে কোনো এক ব্যক্তি হাদীস সংগ্রহের জন্য আসে। শুরুতেই শিক্ষার্থী আবুদ দারদা (রা.) -এর নিকট বললেন, আমি সুদূর মদিনা থেকে আপনার নিকট হাদীস সংগ্রহের জন্য এসেছি। হযরত আবূ দারদা (রা.) তাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, আগমনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই তো? কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্য নিয়ে আসা হয়নি তো? আগমনকারী না সূচক উত্তর দিলেন। অতঃপর হাদীসটি শুনিয়ে দিলেন। -[তিরমীযী]

হাদীস বর্ণনার কথা শুনলে সেখানে লোকজনের ভিড় জমে যেত। একবার হযরত আশ'আফয়া আসবাহী (রা.) মদিনায় আগমন করেন। মদিনা এসে দেখেন একটি স্থানে লোকজনের ভিড়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সেখানে হাদীসের দরস হচ্ছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসের দরস দিচ্ছেন। বাকিরা সকলে তা শুনছেন, শিক্ষা গ্রহণ করছেন। -[তিরমীযি]

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন সামনে মানুষের দেওয়াল হয়ে যেত। -[সহীহ মুসলিম] অন্য বর্ণনায় আছে এক

সাহাবী বলেন, তখন তাকে বাধ্য হয়ে উঁচু স্থানে দাড়িয়ে হাদীস বর্ণনা করতে হতো। -[মুসনাদে আহমদ]

## হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের স্তর

প্রিয়নবী ﷺ -এর সাহাবীদের সংখ্যা সঠিক ভাবে বলা যায় না। কারণ তৎকালে এ ব্যাপারে কোনো পরিসংখ্যান হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞগণ সাহাবীদের সংখ্যা কয়েক লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক সাহাবী-ই পরবর্তী উম্মতের জন্য আদর্শ-সত্যের মাপকাঠি। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা নিজ পরিমণ্ডলে রাসূল ﷺ -এর আদর্শ বাস্তবায়নে ছিলেন বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যে হাদীসশাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সাহাবীর সংখ্যা ১ লক্ষ চৌদ্দ হাজার। এ মত দিয়েছেন হযরত ইমাম আবূ জুর'আ (র.) বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত ইমাম শাফেয়ীর (র.)-এর মতে হাদীসের সাথে সম্পকির্ত সাহাবীর সংখ্যা ৬০ হাজার। এদের মধ্যে ৩০ হাজার ছিল মদিনাবাসী বাকি অন্যান্যরা ছিলেন বিভিন্ন দেশের। এ ষাট হাজারের মধ্যে আবার হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৫শত ৫৪ জন। সাহাবীদের সম্পর্কে রচিত মূল্যবান গ্রন্থ উসদুল গাবায় এমনটি-ই আছে। বিভিন্ন গ্রন্থে যাদের বর্ণনা সংরক্ষিত আছে তাদের সংখ্যা মাত্র ২৫০ জন। এ মত দিয়েছেন হযরত ইমাম আবূ দাউদ তায়ালিসী (র.)। ইমাম যাহাবী (র.) বলেন, সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে যে সকল সাহাবীর হাদীস উল্লেখ আছে তাদের সংখ্যা মাত্র ১০৫ জন। এই ১০৫ জনের ২৮ জন সাহাবী এমন যাদের উপর আমাদের বর্তমান হাদীসশাস্ত্রের ভিত রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫ জনের বর্ণনা সর্বাধিক। হাদীস শাস্ত্রের অর্ধেকের বেশি হাদীস তাদের উপর নির্ভরশীল। পরিভাষায় এদেরকে মুসদিয়ীন বলা হয়।

## হাদীস বর্ণনকারী সাহাবীদের স্তর ৫ ভাগে বিভক্ত

সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ওয়াজিব

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا -

আর এ সম্পদ তাদের জন্যে যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখ না।



উক্ত আয়াতে بَعْدِ [পরে] অর্থে সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছেন এবং এ আয়াত তাদের সবাইকে ফায়-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেননি। বরং এগুলো ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। যাতে এ সম্পত্তির আমদানি বায়তুল মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোনো কোনো সাহাবী তার কাছে বিজিত সম্পদ বন্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এ আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে বন্টন করে দিতাম। যখনই কোনো দেশ বিজয় লাভ করত তার মাল সম্পদ যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। যেমন নবী করীম ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে যে সম্পত্তি সংগ্রহ হচ্ছে এগুলো বন্টন করে দিলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে। -[কুরতুবী]

## মুসলমান পরিচয়ের জন্য সাহাবা প্রীতি অপরিহার্য :

পূর্বেকার আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মুহাম্মাদীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১. মুহাজির সাহাবা, ২. আনসার সাহাবা, ৩. অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন গুণাবলির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর সাধারণ মুসলমানদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র একটি। সাধারণ মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ এ গুণটি হলো সাহাবা প্রেম। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের অগ্রগামিতায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। অনুধাবন করে এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে হওয়ার গুণটি অনুধাবন করে। ভালোভাবে অনুধাবন করে এবং সবার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। নিজের জন্য এরূপ দোয়া কর। আল্লাহ আমাদের অন্তরে কোনো মুসলমানরে প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্মও ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এ শর্ত অনুপস্থিত সে মুসলমান হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই একদা হযরত মুসাব বিন সাদ (রা.) বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল মুসলমান তিন শ্রেণিতে বিভক্ত– ১. মুহাজির সাহাবা ২. আনসার সাহাবা। এ শ্রেণি দু'টি অতিবাহিত হয়েছে। এখন বাকি আছে মাত্র এক শ্রেণি

তাহলো সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোনো আসন কামনা কর তাহলে এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল হযরত উসমানের শাহাদাতে পর, হযরত হুসাইন (রা.) পাল্টা- জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মুহাজির সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। সে নেতিকবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি আনসারগণের একজন? সে বলল না। হযরত হুসাইন (রা.) বললেন এখন মাত্র وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ এ তৃতীয় শ্রেণি বাকি আছে। অর্থাৎ সাহাবীদের প্রতি মহব্বত পোষণকারী শ্রেণী বাকি আছে। তুমি যদি হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে চাও তাহলে এ তৃতীয় শ্রেণি থেকেও খারিজ হয়ে যাবে। বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন কুরতুবী (র.) বলেন, এ তৃতীয় আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব। হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবীদের মন্দ বলে অথবা সাহাবীদের প্রতি মন্দ বিশ্বাস রাখে ইসলামের যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ নেই। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি উক্ত আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায় তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে সকল মুসলমানের অংশ আছে। সুতরাং যার অংশ নেই তার ঈমান-ই যেন সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। সে মুসলমান কিনা এ বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানের জন্য সাহাবায়ে কেরামের উপর দোয়া ও ইস্তেগফার করার আদেশে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানতেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ হবে। সুতরাং তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহেরর কারণে কোনো মুসলমানদের তাদের প্রতি কুধারণা কিংবা সমালোচনা করার অধিকার নেই, এটা মোটেও জায়েজ নয়।

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি তোমাদের নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। এ উম্মত ততদিন ধ্বংস হবে না যত দিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের [বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর] সমালোচনা না করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, তুমি যদি কাউকে সাহাবীদের মন্দ বলতে শুন তাহলে তুমি বলবে, তোমাদের মধ্যে অধিক মন্দের উপর আল্লাহর লা'নত। অধিক মন্দ কিছুতেই সাহাবী হতে পারেন না। যে সাহাবীর সমালোচনা করে সেই অধিক মন্দ। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লা'নতের কারণ।



আওয়াস বিন হাওশাম বলেন, এ উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন যাতে মানুষের অন্তরে তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে দেখেছি। তারা আরও বলতেন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যত বিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না, করলে মানুষের [দুষ্ট মানুষের] ধৃষ্টতা আরো বেড়ে যাবে। -[কুরতুবী]

**হাদীস বর্ণনাকারীদের স্তর নিম্নরূপ–**

১. প্রথম স্তর : যে সকল সাহাবী ১ হাজার বা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।
২. দ্বিতীয় স্তর : যে সকল সাহাবী পাঁচশত কিংবা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৩. তৃতীয় স্তর : যে সকল সাহাবী চল্লিশ কিংবা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৪. চতুর্থ স্তর : যে সকল সাহাবী চল্লিশের চেয়ে কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু যেহেতু ৫০০ থেকে ৪০-এর মধ্যবর্তী সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা অনেক বেশি। তাই মুতাআখখিরীন আলিমগণ এ সংখ্যাকে দু'ভাবে বিভক্ত করা পছন্দ করেছেন। সে মতে সাহাবাদের স্তর ৪টির স্থলে ৫টি হচ্ছে। অর্থাৎ তৃতীয় স্তর ঐ সকল সাহাবী যারা অন্তত একশত কিংবা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ স্তর যাঁরা অন্ততঃ চল্লিশ কিংবা ততোধিক তবে একশয়ের কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম স্তর যাঁরা চল্লিশের কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রথম স্তরের সাহাবীগণের সংখ্যা ৭ জন। তাঁদের শীর্ষভাগে রয়েছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৭৪টি। এ সাত জনের হাদীস সংখ্যা নিম্নরূপ–

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ৫৩৭৪টি।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ২৬৬০টি
৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ২২১০টি।
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ১৬৩০টি।
৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) ১৫৪০টি।
৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) ১২৮৬টি।
৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ১১৭০টি।

দ্বিতীয় স্তরের রেওয়ায়েতকারী সাহাবী মোট ৪জন। তাঁদের শীর্ষস্থানে আছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮টি। যেমন–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ৮৪৮টি।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) ৭০০টি।
৩. হযরত আলী (রা.) ৫৮৬টি।
৪. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ৫৩৯টি।

তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ যাঁরা পাঁচ শয়ের কম কিন্তু ন্যূনতম একশত কিংবা তদূর্ধ্ব হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা মোট ২৬জন। তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) যেমন–

১. হযরত উম্মে সালমা (রা.)। ৩৭৮টি।
২. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ৩৬০টি।
৩. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) ৩০৫টি।
৪. হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) ২৮১টি।
৫. হযরত সাদ ইবনে ওয়াককাস (রা.) ২১৫টি।
৬. হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) ১৮৮টি।
৭. হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) ১৮১টি।
৮. হযরত আবুদ দারদা (রা.) ১৭৯টি।
৯. হযরত আবূ কাতাদা আনসারী (রা.) ১৭০টি।
১০. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ১৬৪টি।
১১. হযরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব (রা.) ১৬৪টি।
১২. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) ১৫৭টি।
১৩. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) ১৫০টি।
১৪. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) ১৪৬টি।
১৫. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) ১৪৬টি।
১৬. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ১৪২টি।
১৭. হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) ১৩৬টি।
১৮. হযরত আবু বাকরাহ (রা.) ১৩০টি।
১৯. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) ১৩০টি।
২০. হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফয়ান (রা.) ১৩০টি।
২১. হযরত ছাওবান মাওলান্নবী (রা.) ১৩০টি।
২২. হযরত উসামা ইবনে ইয়াযীদ (রা. ) ১২৮টি।



২৩. হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা.) ১২৪টি।
২৪. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) ১২৩টি।
২৫. হযরত আবূ মাসউদ উকবা ইবনে আমির (রা.) ১০২টি।
২৬. হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা.) ১০০টি।

চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ যাঁরা ১০০-এর কম তবে ৪০টি কিংবা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা মোট ৩৩ জন। যেমন–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) ৯৫টি।
২. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) ৯২টি।
৩. হযরত আবূ তালহা যায়দ ইবনে সাহল (রা.) ৯২টি।
৪. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা.) ৯০টি।
৫. হযরত যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) ৮১টি।
৬. হযরত কাব ইবনে মালিক আসলামী (রা.) ৮০টি।
৭. হযরত রাফি ইবনে খাদীজ (রা.) ৭৮টি।
৮. হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) ৭৭টি।
৯. হযরত আবু রাফি (রা.) ৬৮টি।
১০. হযরত আউফ ইবনে মালিক আশযায়ী (রা.) ৬৭টি।
১১. হযরত আদী ইবনে হাতিম তায়ী (রা.) ৬৬টি।
১২. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী আওয়ানাহ (রা.) ৬৫টি।
১৩. হযরত উম্মে হাবীবা (উম্মুল মু'মিনীন) (রা.) ৬৫টি।
১৪. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) ৬২টি।
১৫. হযরত সালমান ফারসী (রা.) ৬৪টি।
১৬. উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) ৬০টি।
১৭. হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম কারশী (রা.) ৬০টি।
১৮. হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) ৫৬টি।
১৯. হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা কিনানী (রা.) ৫৬টি।
২০. হযরত উকবা ইবনে আমির জুহানী (রা.) ৫৫টি।
২১. হযরত জুযালা ইবনে উবায়দ আনসারী (রা.) ৫০টি।
২২. হযরত ওমর ইবনে উতবা (রা.) ৪৭টি।
২৩. হযরত কাব ইবনে যারী (রা.) ৪৭টি।

২৪. হযরত ফযলা ইবনে উবায়দ আসলামী (রা.) ৪৬টি।

২৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) ৪৬টি।

২৬. হযরত উম্মে হানী (রা.) ৪৬টি।

২৭. হযরত আবূ হুযাইফা ইবনে ওহাব সিওয়ায়ী (রা.) ৪৫টি।

২৮. হযরত বেলাল ইবনে রিবাহ্ তামীমী (রা.) ৪৪টি।

২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) ৪৩টি।

৩০. হযরত মিকদাদ ইবনে আসাদ কুফী (রা.) ৪২টি।

৩১. হযরত উম্মে আতিয়া আনসারিয়া (রা.) ৪১টি।

৩২. হযরত হাকীম ইবনে হিযাম আসাদী (রা.) ৪০টি।

৩৩. হযরত সালমা ইবনে হুনাইফ আনসারী (রা.) ৪০টি।

পঞ্চম স্তরে অর্থাৎ যে সকল সাহাবী ৪০ কিংবা এর চেয়েও কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা ৪০ জন। যেমন–

১. হযরত যুবাইর ইবনে আউয়াম (রা.) ৩৮টি।

২. হযরত ফাতিমা বিনতে কায়স (রা.) ৩৪টি।

৩. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) ৩২টি।

৪. হযরত ইয়ায ইবনে হাম্মাদ তামীমী (রা.) ৩০টি।

৫. হযরত মালেক ইবনে রাবীয়া সায়িদী (রা.) ২৮টি।

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ২৫টি।

৭. হযরত উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা.) ২৪টি।

৮. হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) ২৫টি।

৯. হযরত আমির ইবনে রাবীআ (রা.) ২২টি।

১০. হযরত রাবীঈ বিনতে মাসউদ (রা.) ২১টি।

১১. হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর আশহালী (রা.) ১৮টি।

১২. হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ১৮টি।

১৩. হযরত ওমর ইবনে হুরাইস (রা.) ১৮টি।

১৪. হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা.) ১৫টি।

১৫. হযরত সাবিত ইবনে যাহহাক (রা.) ১৪টি।

১৬. হযরত মু'আবিয়া ইবনে সালমা (রা.) ১৩টি।

১৭. হযরত উমরাহ ইবনে আবূ জাদ আসাদী (রা.) ১৩টি।



১৮. হযরত বুসরা বিনতে সফওয়ান (রা.) ১১টি।

১৯. হযরত উরওয়া ইবনে মিকরাস (রা.) ১০টি।

২০. হযরত মুজাম্মা ইবনে ইয়াযীদ (রা.) ১০টি।

২১. হযরত সালমা ইবনে কায়স (রা.) ৭টি।

২২. হযরত কাদাতা ইবনে লুকামান (রা.) ৭টি।

২৩. হযরত কবীযা ইবনে মুখারিক আমিরী (রা.) ৬টি।

২৪. হযরত আসিম ইবনে আদী কুযায়ী (রা.) ৬টি।

২৫. হযরত সালিম ইবনে নুআইম আশযায়ী (রা.) ৫টি।

২৬. হযরত মালিক ইবনে সা'সাআ (রা.) ৫টি।

২৭. হযরত মাহজান ইবনে আদরা (রা.) ৫টি।

২৮. হযরত সায়িব ইবনে ফাল্লাহ (রা.) ৫টি।

২৯. হযরত খিফাফ ঘিফারী (রা.) ৫টি।

৩০. হযরত যুফার হাবশী (রা.) ৫টি।

৩১. হযরত মালেক ইবনে হুবাইর কিনদী (রা.) ৪টি।

৩২. হযরত যায়দ ইবনে হারিসা (রা.) ৪টি।

৩৩. হযরত সাবিত ইবনে অদীআ (রা.) ২টি।

৩৪. হযরত কাব ইবনে ইয়ায আশআরী (রা.) ২টি।

৩৫. হযরত কুলছুম ইবনে হুসাইন গিফারী (রা.) ২টি।

৩৬. হযরত দাহয়ায়ে কালবী (রা.) ২টি।

৩৭. হযরত জুযানা বিনতে ওহাব (রা.) ২টি।

৩৮. হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার (রা.) ১টি।

৩৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আহ (রা.) ১টি।

৪০. হযরত কুলসুম ইবনে আলকামাহ (রা.) ১টি।

## রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসতে হবে সাহাবাদের মতো

প্রেম, ভালোবাসা-মহব্বত কেন্দ্রিক সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়া। ভালোবেসেই সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ -কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ -এর খাতিরেই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আঠারো হাজার মাখলূকাত। সেই মহব্বত ও ভালোবাসার সূত্র ধরেই মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা

আশরাফুল মাখলূকাত করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক আইনের নয়, প্রেমের সম্পর্ক। ভালোবাসার সম্পর্ক। আইনের সম্পর্ক সীমাবদ্ধতার সাথে, ভালোবাসার সম্পর্ক উদারতার সাথে। আইনের গণ্ডি, আইনের গতি নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতর। ভালোবাসা এগিয়ে যায় দূরে বহু দূরে। আইন কঠোর, সে শাসন করে, বেত্রাঘাত করে, চোখ রাঙ্গায়। ভালোবাসা বিনম্র, সে আদর করে, স্নেহ করে, মায়া-মমতা শিখায়। আইন মাফ করতে জানে না। ভালোবাসা ক্ষমা করে, পর্বতসম অপরাধ মার্জনা করে দেয়। দূরবর্তীকে কাছে টানার চেষ্টা করে, বারবার চেষ্টা করে। কাছের জিনিসকে দূরে ঠেলে দেয় না। আইনে ব্যর্থতা আছে, আছে পরাজয়, ভালোবাসায় ব্যর্থতা নেই। পরাজয় নেই। আইন দুর্বল, তার কর্মের পরিধি সীমাবদ্ধতায় ঘেরা। আইনের নির্দিষ্ট সীমা পরিবেষ্টিত। ভালোবাসা শক্তিশালী, দৃষ্টি তার দিগন্ত প্রসারী। আইন উষর অনুর্বর, আইন থেকে কিছু জন্মায় না, সৃষ্টি হয় না। সৃজনশীল ক্ষমতা আইনে নেই। ভালোবাসা উর্বর। ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সম্ভাবনা, উজ্জ্বল ভবিষ্যত। আইন নিয়ন্ত্রণ করে লাঠি দিয়ে। ভালোবাসা নিয়ন্ত্রণ করে হাসি মুখে। আন্তরিকতা দিয়ে, হৃদয়ের মাধুরী মাখা পরশে।

ভালোবেসে মহব্বত করেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এত সুন্দর করেছেন। সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন। পৃথিবীকে সাজিয়েছেন মনোরম করে। বনে বনে পাখির কল-কাকলি, গাছে গাছে বিহঙ্গকূলের কলতান, মিষ্টি মিষ্টি কলরব, সুবাতাস তারই সৃষ্টি। তিনিই ভালোবেসে মহব্বত করে এসব সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভালোবেসেছেন রাসূল ﷺ -কে। রাসূলের খাতিরেই তিনি ১৮ হাজার মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন। আর বলে দিয়েছেন আমাকে পেতে হলে রাসূল ﷺ -কে পাওয়ার চেষ্টা কর। আমাকে ভালোবাসতে হলে রাসূল ﷺ -কে ভালোবাস। আমার ভালোবাসার পূর্ব শর্ত হলো রাসূল ﷺ -এর ভালোবাসা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

"আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔



তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা মাতা তার সন্তানাদি ও অন্য সকলের চেয়ে প্রিয়পাত্র না হই।

আল্লাহ তা'আলার চিরন্ত বাণী, রাসূল ﷺ -এর অমর কথা মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। তাইতো সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামাত আল্লাহকে পাওয়ার জন্য রাসূল ﷺ -কে ভালোবেসে ছিলেন। ভালোবেসে ছিলেন মনে প্রাণে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, নিজেদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানাদি সকলের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন রাসূল ﷺ -কে। রাসূল ﷺ -এর আদর্শকে স্থান দিয়েছেন সর্বোচ্চ মাকামে। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে জীবনের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছেন। মেহনত করেছেন। মুজাহাদা করেছেন। সাধনা করেছে- কঠোর সাধনা।

সম্মানিত পাঠক! স্মরণ করুন ওহুদ যুদ্ধের কথা, যুদ্ধের প্রথম পর্ব সবেমাত্র শেষ হয়েছে। পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ হলো। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই ওদের আক্রমণ আরো শাণিত হলো। সাড়াশি আক্রমণ চলল। সাহাবীদের বিক্ষিপ্ততার সুযোগ নিল কাফের সম্প্রদায়। অব্যাহত আক্রমণ চালাল মুসলিম শিবিরে, একপর্যায়ে রাসূল ﷺ -এর উপর আঘাত লাগল। আঘাত করল কুরাইযার আবদুল্লাহ বিন কুসাই। আঘাতটি ছিল প্রচণ্ড। আঘাতের চোটে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ভেঙ্গে গেল। পবিত্র চেহারায় কড়া দুটি যন্ত্রণা করছিল। এগিয়ে এলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। কড়া খুলতে আগে বাড়লেন। এমনি মুহূর্তে পিছন থেকে আওয়াজ এল। আবূ বকর থামুন। আল্লাহর ওয়াস্তে মহান এ খেদমতটি আমাকে করার সুযোগ দিন। হযরত আবূ উবাইদা (রা.) এভাবে হযরত আবূ বকরকে বিরত রাখলেন। তিনি হাতে নয় মুখে কামড় দিয়ে কড়া বের করলেন। প্রথম কামড়ে একটি কড়া বের হয়ে আসল। সাথে সাথে হযরত আবূ উবাইদা (রা.) -এর একটি দাত উপড়ে গেল। রক্ত এখন আবূ উবাইদা (রা.)-এর মুখ থেকেও ঝরছে। অবস্থার নাজুকতা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) আবার এগিয়ে এলেন। আবার বাধ সাজলেন আবূ উবাইদা (রা.) দোহাই লাগে। শ্রদ্ধেয় আবূ বকর আমাকে আরেকটু সুযোগ দিন। আবারো পূর্বের মতোই দাত দিয়ে রয়ে যাওয়া কড়াটি টান দিলেন। বের হয়ে আসল কড়াটি। সাথে সাথে হযরত আবূ উবাইদা (রা.) -এরও আরেকটি দাত উপড়ে গেল। ইতিমধ্যে সাহাবীদের একটি দল রাসূল ﷺ -এর চারদিকে ঘিরে দাড়াল। অপর প্রান্ত হতে তীর-তরবারির যেন বৃষ্টি হচ্ছিল। একের পর এক তীর তরবারি আসছিল অবিরাম গতিতে। ঢাল হয়ে দাড়িয়ে রইলেন সাহাবায়ে কেরাম, শিষা ঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি আঘাতও যেন রাসূল ﷺ -এর গায় না লাগে। এদিক

৭০টির উপরে তীর সহ্য করেন — হযরত তালহা (রা.)

সতর্ক দৃষ্টি ছিল সকলের। হযরত আবূ দুজানা (রা.) ও হযরত তালহা (রা.) ঘুরে ঘুরে তীর তরবারির আঘাত সইছিলেন বারবার। যেদিক থেকে তীর তরবারির আঘাত আসত তাদের শরীরে বিধে যেত। এতে হযরত তালহা (রা.) -এর একটি হাত কেটে যায়, যুদ্ধ শেষে হিসেব করে দেখা গেছে হযরত তালহা (রা.) -এর শরীরে সত্তরটির অধিক জখম হয়েছিল। -[কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৭৪]

আত্মোসর্গকারী এ সকল সাহাবীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত তালহা (রা.)। রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে পরিস্থিতি দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হযরত তালহা রাসূল ﷺ -এর এ চেষ্টায় বাধা দেন। তিনি বলেন, হে রাসূল! আপনি দয়া করে মাথা উঁচু করবেন না। আপনার শরীরে একটি আচড়ও লাগতে দিব না আমরা। আমার বুক আছে, যতবার সইতে হয়, এ বুক তৈরি আছে। যত আঘাত সইতে হয়, আমি সইব, আপনার শরীরে যেন আঘাত না লাগে। -[বুখারী শরীফ]

এক সাহাবী এসে জিজ্ঞেস করলেন যুদ্ধে আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে বিনিময়ে কি পাব, হুজুর ﷺ বললেন বিনিময়ে জান্নাত পাবে। তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। ফেলে দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। এমনিভাবে ভালোবেসে ছিলেন হযরত বেলাল (রা.)। আঘাতে আঘাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, শরীর জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা ছাড়েননি। ভালোবেসে হযরত খাব্বাব (রা.), আম্মার ও ইয়াছির (রা.), বাসর রাত্রে টগবগে যুবক হযরত জাফর তায়য়ার (রা.) স্ত্রী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। স্ত্রীর মহব্বত ছেড়ে রাসূলের মহব্বতে জীবন সপে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাস্তায়।

রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসার অর্থ তার আদর্শকে ভালোবাসা। তার রেখে যাওয়া নীতি-আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই রাসূল ﷺ -এর প্রতি ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটবে। রাসূল ﷺ -এর প্রতি মহব্বত অনুরাগের দাবিই হলো তার রেখে যাওয়া আদর্শের অনুসরণ। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ–

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

অর্থাৎ, রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা আকড়ে ধরো এবং তিনি যেগুলো থেকে নিষেধ করেন সেগুলো থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ -এর রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়নে ছিলেন সুদৃঢ়, অবিচল অনড়। কোনো রকম বাধা বিপত্তি তাদের পিছু হটাতে সক্ষম হয়নি। ১ম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) খেলাফত লাভের পর বিভিন্ন ফেৎনা দেখা দিল। কেউ কেউ বাহ্যত অস্বীকার করতে লাগল। জাকাত দিতে চাইল না। নওমসুলিম অনেক মুরতাদ হওয়ার



উপক্রম হলো। ঐদিকে মুসায়লামাতুল কাযযাব নিজেকে নবী দাবি করে বসল। ইহুদি চক্র চারদিকে ফেৎনার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। সব কিছু মিলিয়ে একটি এলোমেলো অবস্থা বিরাজ করছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন, বিশৃঙ্খল অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য গর্জে উঠলেন, কোনো কিছুতেই সামান্যতম ছাড় দেওয়া যাবে না। শক্ত হাতে প্রতিরোধ করতে হবে সকল ফিৎনা। তার দীপ্ত কণ্ঠে অনুরণিত হলো– اَيُنْقَصُ الدِّيْنُ وَاَنَا حَيٌّ দীনের ক্ষতি আর আমার উপস্থিতি এ দু'টি একসাথে হতে পারে না। দীনের সামান্যতম ক্ষতি হবে। আর আবূ বকর জীবিত থাকবে এ হতে পারে না। হতে দেব না। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ঘোষণা, বিদ্যুৎ পতিত দিগবিদিক উচ্চারিত হতে লাগল اَيُنْقَصُ الدِّيْنُ وَاَنَا حَيٌّ সকলের কণ্ঠে একই বাণী, একটিই ধ্বনি। জিহাদের জন্য প্রতিনিধি দল পাঠানো হলো। সকল ফিৎনা মিটে গেল, আবার চলতে থাকল সব কিছু ঠিক মতো।

সুতরাং আজ আমাদেরও রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসতে হবে সাহাবাদের মতো করে। সাহাবাদের ভালোবাসা রাসূল ﷺ কবুল করেছেন, গ্রহণ করেছেন সানন্দে সোৎসাহে। প্রেমিককে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তার প্রেম নিবেদন পথ-পন্থা প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় কি না। কারণ প্রেমিক মানে-ই প্রেমাস্পদের জন্য উৎসর্গিত একটি ব্যাকুল হৃদয়, ব্যাকুল হৃদয়ের যত আকুতি পরিবেশনা হবে সবই প্রেমিকের কাজ, তবে এ পরিবেশনা উপস্থাপনা হতে হবে প্রেমাস্পদের চাহিদা অনুযায়ী। প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় মনোনীত কাজে বাস্তবায়ন প্রেমিকের জীবন মরণ বাজি হতে হবে। তবে সে প্রেমে প্রাণ পাবে, রঙ ধরবে। তবে এসব অবশ্যই হতে হবে প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় পথের আলোকে। একটি উদাহরণ পেশ করা যায়।

মাতা অসুস্থ, বয়স ৯০ বছর। বৃদ্ধা মাতা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত। পানির জ্বালায় কাতরাচ্ছে। পানির পিপাসায় মুর্ছা যাচ্ছে, শাস-নিশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে, দেখার কেউ নেই। এক মুঠো ভাত মুখে তুলে দেওয়ার মতো লোক নেই, জিহ্বাটি ভিজানোর জন্য এক চামচ পানি দেওয়ার কোনো জন নেই। প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। প্রাণ পাখি যায় যায় ভাব। কনকনে শীতে কাপছে জীর্ণ শরীর। শরীরে দেওয়ার একটি লেপ নেই। কোনো রকম কাথা পেচিয়ে দিন রাত যাপন করছে। চারদিকে মানুষ আছে তবে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। সকলে এ অসহায়ত্ব পরিদর্শন করছে ঘুরে ঘুরে। এমনি সময়ে তার একমাত্র ছেলে এসে উপস্থিত। এ চরম ক্রান্তি লগ্নে ছেলেকে দেখে মা খুশিতে টগবগ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে। আশাবাদী হয়ে

উঠেন অসহায় মা। ছেলের সহযোগিতা পাবে বলে। ছেলে এসে মাকে দেখলেন, বুঝলেন মায়ের অসহায়ত্ব। এরপর তিনি যা করলেন তাহলো, বক্তৃতা শুরু করলেন। দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন হে মা! তুমি আজ অসুস্থ। বৃদ্ধা তুমি বড় অসহায়। দেখার কেউ নেই। সাহায্য করার মতো কাউকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ তোমার সাহায্য দরকার তোমার কাপড় নেই। হাড় কাঁপানো এ শীতে তোমার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। তোমার পেটে ক্ষুধা আছে। শরীরে বস্ত্র আছে, আছে পেটে পীড়া। তাই আজ তোমার সেবা দারকার। দরকার খাবারের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা দরকার, উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রামে নয় তোমার এ চিকিৎসা করতে হবে বাসায়। আমি তোমার সন্তান। তুমি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছ, ছোট বেলায় লালন-পালন করেছ, দুধ-ফিটার খাইয়েছ। তাই আজ আমার সহযোগিতা করা দরকার। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর মা আমি ঢাকা যাই দু'নি পর ছুটি পেলে আবার আসব। ঐ সময় সব ব্যবস্থা হবে।

এভাবে যদি কোনো চাটুকার তার মাতার প্রতি ভালোবাসা দেখায় তাহলে সে ভালোবাসা ঐ মা কিভাবে বরণ করবে আপনারাই ভালো বলতে পারবেন?

সুতরাং রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসার নামে যদি কোনো হতভাগা মূর্খ জুলুম করে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে, বাধ্যতামূলক মনে করে দাড়িয়ে মীলাদ পড়ে, নবীর জন্ম দিনে-ঈদে-মীলাদুন্নবী উদযাপন করে, তাহলে এ দুর্ভাগা পরকালে রাসূল ﷺ -এর মুখে কেবল সুহকান সুহকান 'দূর হও দূর হও'-শব্দই শুনতে পাবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এমনি মুর্খতার ভালোবাসা পোষণ করেননি। তারা রাসূল ﷺ -এর জন্ম দিবসে-ঈদ উদযাপন করেননি। নবী করীম ﷺ আল্লাহর জাতি নূরের তৈরি বলে বিতর্কের ঝড় তুলেননি। রাসূল হাজির-নাজির, তিনি গায়েব জানেন এমনি অবান্তর দাবি ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তুলেননি। অতএব মুক্তি পেতে হলে সাহাবাদের মতো রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসতে হবে। সাহাবাদের মতো রাসূল ﷺ -এর আদর্শ আকড়ে ধরতে হবে। মুখে বুলি আওড়িয়ে নয়, কাজে কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে নবী প্রেম দেখাতে হবে।

## সূরা ফাত্হ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি

অধিকাংশ সাহাবী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ঐ হিজরিতে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূল ﷺ ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরিফ নিয়ে যান এবং হিমসের সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর কাফেররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে।



অতঃপর তারা এ সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদিনায় ফিরে যাবেন পরবর্তী বছর এ ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কেরামের অনেকেরই বিশেষতঃ হযরত ওমর (রা.) এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ খোদায়ী ইঙ্গিতে এ সন্ধিকে প্রচ্ছন্নভাবে মুসলমানদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওমরার ইহরাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন। তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনো হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এ সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে "প্রকাশ্য বিজয়" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন, তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার ঘটনার 'বায়াতে-রিজওয়ান'কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বৃক্ষের নিচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বায়াতের আলোচনাও করা হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

**হুদায়বিয়া :** হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এ স্থানটিকে "শমীসা' বলা হয়। ঘটনাটি এ স্থানেই ঘটে।

**রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্ন :** আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জারীর বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনার এক অংশ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করেছেন। এবং ইহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়ামানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লাহ প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর নিকট ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এ ঘটনার কোনো সন তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটা মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে

কেরামের প্রস্তুতি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোনো বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এ মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। -[বয়ানুল কুরআন]

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা পূর্বেই বলা হয়েছে। সন্ধির শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতিরেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে কষ্টকর ছিল। তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রাসূলুলাল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্যে অটল ও অনঢ় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য সূরা ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনান। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত ওমর (রা.) আবার প্রশ্ন করে বসলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। একথার পর কাল বিলম্ব না করে সাহাবীগণ (রা.) মাথা নত করে নিলেন। এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে গ্রহণ করেন।

**হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ :**

এ ব্যাপারে প্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশক পায় যে, কুরাইশ ও তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তড়িঘড়ি আবূ সুফিয়ানকে মদিনায় প্রেরণ করল চুক্তি নবায়ন করার জন্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তি নবায়ন করলেন না। এবং অবশেষে দশ হাজারের খোদায়ী লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কুরাইশরা এত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় কোনো যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে না, যুদ্ধের মাধ্যমে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

মোটকথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন, মাথা মুণ্ডান ও চুল কাটেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহ প্রবেশ



করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সাবধান করে বলেন, এ ঘটনার কথা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন, এ ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে কোনো বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না। বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাতহে' আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বুঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন- لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ -এখানে প্রথমোক্ত لَامْ -কে কারণ বর্ণনার জন্য ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই : [এক] আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদের প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কুরআনে যেখানে যেখানে ذَنْب অথবা عِصْيَان [গোনাহ] শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ত্রুটি যাকে কুরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذَنْب তথা গোনাহ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। مَا تَقَدَّمَ বলে নবুয়তের পূর্ববর্তী ত্রুটি এবং مَا تَأَخَّرَ বলে নবুওয়ত লাভের পরবর্তী ত্রুটি বুঝানো হয়েছে। -[মাযহারী]। প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্যে যে, এ প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামি দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে। এবং তাঁর ছওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, ছওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। -[বয়ানুল কুরআন]

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন। শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এ প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতেহার তফসীরে হেদায়েত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়েত একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ হেদায়েতের অর্থ অভিষ্ট মঞ্জিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের অভীষ্ট মঞ্জিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির ও অসংখ্য এবং অগণিত স্তর রয়েছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকি থাকে। কোনো বৃহত্তর ওলী এমনকি নবী-রাসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এর কারণেই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এ প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রাসূল্লাহ ﷺ -কে দান করেছেন, যাকে يَهْدِيَكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় স্তর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন। এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তার একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

সমাপ্ত

- আদর্শ সন্তান : মাওলানা আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী (ভারত)
- আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অজিফা : মাওলানা এনামুল হক সন্দিপী
- আশরাফ আলী থানভী [র.]-এর জীবনী :
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে– ১ : মাওলানা সিদ্দীক আহমদ নোমান
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে– ২ : " " "
- ইমাম আবু হানিফা (রা.) : স্মারকগ্রন্থ : সাইয়্যেদ তারেক আলী শাহ হাজারাভী
- ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ : মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ লুদয়ানভী
- দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)
- আত্মীয়-স্বজনের হক ও হুকূকুল ইবাদ : শায়খুল হাদীস জাকারিয়া (র.)
- ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা : মাওলানা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জিহাদী
- কুরআন আপনাকে কি বলে? : মাওলানা মনযূর নোমানী (র.)
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসআলা-মাসায়েল : মুফতি রাফআত কাসেমী (দা. বা.)
- কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি : মাও. পীর যুলফিকার নকশবন্দী
- খুতবাতে যুলফিকার– ১০ : মাও. পীর যুলফিকার নকশবন্দী
- খুতবাতে যুলফিকার– ১১ : " " " "
- খোৎবাতুল আহকাম [বাংলা] : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ : মাওলানা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জিহাদী
- তাকবিয়াতুল ঈমান : হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র.)
- কিয়ামত কবে হবে : মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী (র.)
- তাওবার বিস্ময়কর ঘটনা : আল্লামা ইবনে কুদামা মুকাদ্দেসী (র.)
- বেহেশতী জেওর বাংলা [১ম-৫ম] : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)
- বেহেশতী জেওর বাংলা [৬ষ্ঠ-১০ম] : " " " "
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ : রুহুল আমীন বাবুল
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে? : মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী
- মাযহাব মানি কেন? : মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
- মাসায়েলে মাইয়্যিত : মুফতি হাফীজুদ্দিন
- মুসলিম রমণী : মাওলানা মোহাম্মদ উবাইদুল হক
- অভিশপ্ত ইহুদী সম্প্রদায় : মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
- রনাঙ্গণে রাসূলুল্লাহ ﷺ [১ম -৮ম খণ্ড] : " " " "
- শবে বরাত করণীয় বর্জনীয় : মাওলানা জহিরুল ইসলাম

জনপ্রিয়তার শীর্ষে

## যে গল্পে হৃদয় গলে সিরিজ

১. যে গল্পে হৃদয় গলে-১ : মাওলানা মুফিজুল ইসলাম (দা. বা.)
২. যে গল্পে হৃদয় গলে-২ : " " " "
৩. যে গল্পে হৃদয় গলে-৩ : " " " "
৪. যে গল্পে অশ্রু ঝরে : " " " "
৫. যে গল্প হৃদয় কাড়ে : " " " "
৬. যদি এমন হতাম : " " " "
৭. ঈমানদীপ্ত কাহিনী : " " " "
৮. অশ্রুভেজা কাহিনী : " " " "
৯. যে গল্পে হৃদয় জুড়ে : " " " "
১০. যে গল্পে হৃদয় কাঁদে : " " " "
১১. হারানো দিনের সোনালী কাহিনী : " " " "
১২. হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী : " " " "
১৩. সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী : " " " "
১৪. সোনালী সংসার (উপন্যাস) : " " " "
১৫. নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী : " " " "
১৬. যে গল্পে হৃদয় কাঁপে : " " " "
১৭. যে গল্পে মানুষ গড়ে : " " " "
১৮. গল্পে গল্পে মানুষ গড়ে : " " " "
১৯. হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনী : " " " "
২০. যে গল্পে ঈমান বাড়ে : " " " "
২১. ব্যথিত হৃদয় [উপন্যাস] : " " " "
২২. অব্যক্ত যন্ত্রণা [উপন্যাস] : " " " "
২৩. জীবন গড়ার টুকরো কথা-১ : " " " "
২৪. আদর্শ কিশোর কিশোরী-১ : " " " "
২৫. আদর্শ যুবক-যুবতী-১ : " " " "
২৬. আদর্শ স্বামী-স্ত্রী-১ : " " " "
২৭. যে গল্পে হৃদয় ভরে : " " " "
২৮. যে গল্পে হৃদয় সাজে : " " " "
২৯. যে গল্পে হৃদয় খুলে : " " " "
৩০. জীবন গড়ার টুকরো কথা-২ : " " " "
৩১. হৃদয়ছোঁয়া ঘটনাবলী-১ : " " " "
৩২. জীবন গড়ার টুকরো কথা-৩ : " " " "

৩৩. মোবাইল ফান ব্যবহার : মাওলানা মুফিজুল ইসলাম (দা. বা.)
৩৪. আদর্শ কিশোর কিশোরী-২ : " " " "
৩৫. সুখের নীড় (উপন্যাস) : " " " "
৩৬. হৃদয়ের রক্তক্ষরণ [উপন্যাস] : " " " "
৩৭. আদর্শ যুবক-যুবতী-২ : " " " "
৩৮. আদর্শ যুবক-যুবতী-৩ : " " " "
৩৯. আদর্শ স্বামী-স্ত্রী-২ : " " " "
৪০. আদর্শ স্বামী-স্ত্রী-৩ : " " " "
৪১. যে গল্পে শান্তি মিলে-১ : " " " "
৪২. গল্প নয় পরশ পাথর-১ : " " " "
৪৩. পথ বদলাও মুসাফির-১ : " " " "
৪৪. পথ বদলাও মুসাফির-২ : " " " "
৪৫. মুঠোফোন বিড়ম্বনা [উপন্যাস] : " " " "
৪৬. যে গল্পে হৃদয় জাগে : " " " "
৪৭. মহীয়সী নারী [উপন্যাস] : " " " "
৪৮. কারবালার প্রকৃত ইতিহাস : " " " "
৪৯. পর্দা ও নারী-১ : " " " "
৫০. পর্দা ও নারী-২ : " " " "

## আমাদের প্রকাশিত অভিধান সিরিজ

- লোগাতুল কুরআন [আরবি-বাংলা] : মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক
- মিসবাহুল লুগাত [আরবি-উর্দু] : আবুল ফযল মাও. আব্দুল হাফীজ বালয়াবী (র.)
- মিসবাহুল লুগাত [আরবি-বাংলা] : মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক
- আল-কামূসল জাদীদ [আরবি-বাংলা] : মাও. ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভী (র.)
- আল-মুরাদিফ [আরবি-বাংলা] আরবি সমার্থ শব্দকোষ : মাও. শামসুল হক
- আল-কামূসুল ইসতেলাহী [আরবি-বাংলা] : মাও. ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভী (র.)
- আলমু'জামুল ওয়াজীয [আরবি-আরবি] :
- আলমু'জামুল ওয়াছীত্ব [আরবি-আরবি] :
- আধুনিক বাংলা অভিধান : রুহুল আমীন বাবুল
- ইংরেজি পকেট ডিকশনারী : শহিদুল ইসলাম
- কামূসুল আযদাদ [আরবি-বাংলা] : সম্পাদনায় : মাওলানা আহমদ মায়মুন
- আল মু'জামুল মুফীদ [বাংলা-আরবি-ইংরেজি] : মাও. আব্দুল কাদের খন্দকার
- তিন ভাষার আধুনিক ওয়ার্ড বুক : মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের (দা. বা.)



## আমাদের প্রকাশিত কওমী মাদরাসার আরবি বাংলা কিতাবসমূহ

### দাওরায়ে হাদীস

- নাসরুল বারী শরহে বুখারী [বাংলা]
- ইন আমুল বারী শরহে বুখারী [বাংলা] : শায়খুল হাদীস মাও. আমিন (র.)
- হিদায়াতুল কারী ইলা হল্লিল বুখারী [বাংলা] : মাওলানা বশির
- মুকাদ্দামায়ে মুসলিম বাংলা [ফয়জুল মুনঈম] : মাও. সাঈদ আহমদ পালনপুরী (র.)
- দরসে তিরমিযী [বাংলা] : মুফতি তক্বী উসমানী (দা. বা.)
- নিয়ামুল মুনঈম শরহে মুসলিম [আরবি-বাংলা ১ম খণ্ড] : মাও. নোমান আহমদ
- শামায়েলে তিরমিজী [আরবি-বাংলা] : আবূ ঈসা মুহা. ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.)

### জামাতে মেশকাত

- মেশকাত শরীফ [বাংলা ১ম] : মাওলানা আহমদ মায়মূন (দা. বা.)
- মেশকাত শরীফ [বাংলা ২য়] : " " " "
- মেশকাত শরীফ [বাংলা ৩য়] : " " " "
- মেশকাত শরীফ [বাংলা ৪র্থ] : " " " "
- মেশকাত শরীফ [বাংলা ৫ম] : " " " "
- মেশকাত শরীফ [বাংলা ৬ষ্ঠ] : " " " "
- মেশকাত শরীফ [বাংলা ৭ম] : " " " "
- নুখবাতুল ফিকার [আরবি বাংলা] : ইবনে হাজার আসকালানী (র.)
- মাজাহেরে হক [আরবি বাংলা] : মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের
- তাফসীরে বায়জাবী [আরবি বাংলা] : আল্লামা কাজী নাসিরউদ্দিন আল বায়যাবী (র.)

## জামাতে জালালাইন

- 🕮 তাফসীরে জালালাইন [বাংলা ১ম] : মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
- 🕮 তাফসীরে জালালাইন [বাংলা ২য়] : " " " " "
- 🕮 তাফসীরে জালালাইন [বাংলা ৩য়] : " " " " "
- 🕮 তাফসীরে জালালাইন [বাংলা ৪র্থ] : " " " " "
- 🕮 তাফসীরে জালালাইন [বাংলা ৫ম] : " " " " "
- 🕮 তাফসীরে জালালাইন [বাংলা ৬ষ্ঠ] : " " " " "
- 🕮 তাফসীরে জালালাইন [বাংলা ৭ম] : " " " " "
- 🕮 ফাউজুল কাবীর [আরবি-বাংলা] : শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)
- 🕮 রিয়াজুস সালেহীন [আরবি-বাংলা] :
- 🕮 দিওয়ানে মুতানাব্বিহ [আরবি-বাংলা] : আবূ তায়্যিব মুতানাব্বী (র.)
- 🕮 আকিদাতুত ত্বহাবী [আরবি-বাংলা] : ইমাম আবূ জাফর আত ত্বাহাবী (র.)
- 🕮 আশরাফুল হিদায়া [আরবি-বাংলা ১ম] : সম্পাদনায় মাও. ইসহাক ফরিদী (র.)
- 🕮 আশরাফুল হিদায়া [আরবি-বাংলা ২য়] : " " " " "
- 🕮 আশরাফুল হিদায়া [আরবি-বাংলা ৩য়] : " মাওলানা আহমদ মায়মূন
- 🕮 আশরাফুল হিদায়া [আরবি-বাংলা ৫ম] : " " " "
- 🕮 আশরাফুল হিদায়া [আরবি-বাংলা ৬ষ্ঠ] : " " " "
- 🕮 আশরাফুল হিদায়া [আরবি-বাংলা ৯ম] : " " " "
- 🕮 নূরুল আনোয়ার সুন্নাহ [আরবি-বাংলা] : অনুবাদ- মাও. শামসুল হক

## জামাতে শরহে বেকায়া

- 🕮 নূরুল কুলূব (তরজমায়ে কুরআন) আরবি-বাংলা : আশরাফ আলী থানভী (র.)
- 🕮 শরহে বেকায়া [আরবি-বাংলা ১ম খণ্ড] : ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (র.)
- 🕮 শরহে বেকায়া [আরবি-বাংলা ২য় খণ্ড] : " " " "
- 🕮 মাকামাতে হারীরী [আরবি-বাংলা] আবূ মুহা. আল কাসিম ইবনে আলী আল হারীরী আল বসরী (র.)
- 🕮 মুখতাসারুল মাআনী [আরবি-বাংলা] : মাওলানা আবূ বকর কাসেমী
- 🕮 নূরুল আনোয়ার কিতাবুল্লাহ [আরবি-বাংলা] : ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদভী (র.)
- 🕮 আততব্রীকু ইলাল ইনশা [বাংলা ৩য় খণ্ড]
- 🕮 সিরাজী [আরবি-বাংলা] : ইমাম সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রশিদ
- 🕮 ফয়জুল কালাম [বাংলা] : মুফতিয়ে আযম মুফতি ফয়েজুল্লাহ (র.)



## জামাতে শরহে জামী

- 🕮 উসুলুশ শাশী [আরবি-বাংলা] : ইসহাক ইবনে ইবরাহীম
- 🕮 নফহাতুল আরব [আরবি-বাংলা] : মাও. আব্দুল গাফফার শাহপুরী
- 🕮 দুরুসুল বালাগাতা [আরবি-বাংলা] : আবুল আফজাল মুহা. ফজলুল হক (র.)
- 🕮 আল ফিয়াতুল হাদীস [আরবি-বাংলা]

## জামাতে কাফিয়া

- 🕮 কাফিয়া [আরবি-বাংলা] : জালালুদ্দিন আবূ আমর উসমান ইবনে ওমর (র.)
- 🕮 কুদূরী [আরবি-বাংলা ১ম] : আল্লামা আবুল হাসান আহমদ ইবনে আবূ বকর (র.)
- 🕮 কুদূরী [আরবি-বাংলা ২য়] : আল্লামা আবুল হাসান আহমদ ইবনে আবূ বকর (র.)
- 🕮 লামিয়াতুল মু'যিজাত [আরবি-বাংলা] : ফখরুল উলামা হাবীবুর রহমান
- 🕮 মেরকাত [আরবি-বাংলা] : মাওলানা ফজলে ইমাম খায়রাবাদী (র.)
- 🕮 সিরাতে মুস্তফা [বাংলা ১/২/৩] : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)
- 🕮 কালয়ূবী [আরবি-বাংলা] : আবূ তাহের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.)
- 🕮 ফুসূলে আকবরী [ফার্সি-বাংলা] : আবূ উসমান বকর আল মাজানী (র.)
- 🕮 খেলাফতে রাশেদা [বাংলা]

## জামাতে হেদায়াতুন নাহু

- 🕮 হেদায়াতুন নাহু [আরবি-বাংলা] : শায়খ সিরাজুদ্দিন উসমান (র.)
- 🕮 নুরুল ইযাহ [আরবি-বাংলা] : আবুল বারাকাত হাসান ইবনে আম্মার (র.)
- 🕮 ইলমুসসীগাহ [আরবি-বাংলা] : আবূ তাহের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.)
- 🕮 যাদুত তালেবীন [আরবি-বাংলা] : মাওলানা আশেক ইলাহি বুলন্দশহরী
- 🕮 মুফীদুত তালেবীন [আরবি-বাংলা] : আল্লামা মুহাম্মদ আহসান নানুতাবী (র.)
- 🕮 তাইসীরুল মান্তেক [আরবি-বাংলা] : মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
- 🕮 তারিখুল ইসলাম [উর্দু-বাংলা] : মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া সাহেব (র.)
- 🕮 ফিকহুল মুয়াছছার [আরবি-বাংলা] : শফীকুর রহমান নদভী (র.)
- 🕮 তালিমুল মুতায়াল্লিম [আরবি-বাংলা] : মাওলানা বুরহানুদ্দীন

## জামাতে নাহবেমীর

- 🕮 নাহবেমীর [বাংলা] : মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের (দা. বা.)
- 🕮 পাঞ্জেগাঞ্জ [বাংলা] : " " " "
- 🕮 মালাবুদ্দাহ [ফার্সি-বাংলা] : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.)
- 🕮 শরহে মিআতে আমেল [আরবি-বাংলা] : মাওলানা আবুল কালাম মাসূম
- 🕮 রওজাতুল আদব [আরবি-উর্দু-বাংলা] : মাও. মোশতাক আহমদ চরথালভী
- 🕮 কাইফা নাতাআল্লামুল ইনশা [বাংলা] – ১ম খণ্ড : মাও. সফিউল্লাহ ফুয়াদ
- 🕮 প্রশ্নোত্তরে সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া [বাংলা] : মুফতি মহিউদ্দীন কাসেমী

## জামাতে মীযান

- 🕮 দরসে মীযান [বাংলা] : মুফতি ওয়ালিউল্লাহ কাসেমী
- 🕮 মিযান [বাংলা] [লাল মীযান] : মাওলানা আবুল কাসেম
- 🕮 ইলমুস সরফ [ফার্সি-বাংলা] : মাও. মোশতাক আহমদ চরথালভী
- 🕮 বেহেশতী জেওর [১-৫ বাংলা] : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)
- 🕮 বেহেশতী জেওর [৬-১০বাংলা] : " " " "
- 🕮 সফওয়াতুল মাসাদির [বাংলা] : মাও. মোশতাক আহমদ চরথালভী
- 🕮 সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া [বাংলা] : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)
- 🕮 পান্দেনামা [ফার্সি-বাংলা] : আল্লামা ফরিদউদ্দিন আত্তার (র.)
- 🕮 বেহেশ্তী গাওহার [বাংলা] : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)

## জামাতে তাইসীর

- 🕮 তালিমুল ইসলাম [১-৪ বাংলা] : মুফতি কেফায়েতুল্লাহ
- 🕮 ফার্সি পহেলী [ফার্সি-বাংলা] : মাও. শেখ রফিকুল ইসলাম সিরাজী
- 🕮 কারীমা [ফার্সি-বাংলা] : আল্লামা শেখ সাদী (র.)

ইসলামিয়া কুতুবখানা-ঢাকা

ইসলামিয়া কুতুবখানা-ঢাকা